নৌবিদ্রোহ

বলাই চন্দ্র দত্ত

(পরিশিষ্ট—পান্নালাল দাশগুপ্ত)

কম্পাস পাবলিকেশনস্‌ লিমিটেড

REVOLT OF THE INNOCENTS

***BY* B. C. DUTT**

মূল ইংরাজী পাণ্ডুলিপি থেকে অনূদিত

প্রথম প্রকাশ :

এপ্রিল—১৯৬০

প্রচ্ছদ :

বুলবুল চৌধুরী

প্রকাশক :

শম্ভু ঘোষাল

কম্পাস পাবলিকেশনস্ লিমিটেড

৩০।১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :

বিমল চন্দ্র মিত্র

শ্রীগোপাল আর্ট প্রেস,

১০, আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

নৌ বি দ্রো হ

লেখক—বলাই চন্দ্র দত্ত

মুখবন্ধ

১৭৫৭ সাল—ভারতে ইংরেজ শক্তির সূত্রপাতের সূচক। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার ক্ষমতার পরাভব ঘটে এবং সে ক্ষমতা ইংলণ্ডে স্থানান্তরিত হয়। আর সেই ক্ষমতা বক্সার যুদ্ধে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে ১৮৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ সামিল হয় ইউনিয়ন জ্যাকের তলায়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিদ্রোহই বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থান। সেই অভ্যুত্থান হয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত। তার উননব্বই বৎসর বাদে, রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভীর রেটিং জাতীয় নৌসৈন্যেরা আবার ঘটায় বিদ্রোহ। সে বিদ্রোহও হয় ব্যর্থ। সে নৌ-বিদ্রোহে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন বয়সে তরুণ, চরিত্রে আদর্শবাদী, রাজনীতিবিদ হিসাবে অনভিজ্ঞ নিরীহ। তাহ'লেও সেই ঘটনাই বৃটিশকে বাধ্য করেছিল ভারতের বাস্তব অবস্থাকে উপলব্ধি

ক'রে নতুন পরিস্থিতিকে মেনে নিতে। কারণ এই বিদ্রোহ ঘটিয়েছিল নৌসৈন্যের আনুগত্যের ভিত্তিতে কম্পন, আর সেই কম্পন সম্প্রসারিত হয়ে পড়েছিল অপর দুই সামরিক বিভাগে। ফলে ক্ষমতা হস্তান্তরের আয়োজন ত্বরান্বিত করা হয়। নৌ-বিদ্রোহের আঠার মাস বাদে আসে ভারতের স্বাধীনতা।

রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভীর বিদ্রোহের সহিত সংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রাসঙ্গিক প্রামাণ্য নথিপত্র রয়েছে ভারতের প্রতিরক্ষা বিভাগের তোষাখানায়। এই বিদ্রোহের ব্যাপক হিসাব বিবরণ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হ'তে পারে কেবলমাত্র ভারত সরকারের উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায়। তথাপি আজও সরকারীভাবে ইতিহাস রচনার কোন প্রচেষ্টা হয়নি, হয়নি কোনো ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোন বেসরকারী প্রচেষ্টা। এই লেখাটি হলো ঘটনাবলীর একটি রেখাচিত্র—রেটিং নাবিকদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিশ্লেষণ।

নৌ-বিদ্রোহ

ইষ্ট ইণ্ডিজে ব্যবসায়রত বণিকগণের মহামান্য কোম্পানী পাঠিয়েছিলেন এক স্কোয়াড্রন যুদ্ধ জাহাজ ক্যাপ্টেন টমাস বেস্টের অধীনে। ড্রাগণ, ওসিয়েণ্ডার, জেম্‌স্‌ ও সোলোমান জাহাজগুলি নিয়ে গঠিত ছিল সে স্কোয়াড্রন। সে সময়ে ১৬১২ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর স্থাপিত হয় রয়েল্‌ ইণ্ডিয়ান নেভী (RIN)। ভারত শাসন করতো পরাক্রান্ত মোগলগণ। বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করে বেস্টকে বাধিত করলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। বস্তুতঃ ক্যাপ্টেন বেস্টের মর্জির ওপরই ছেড়ে দেওয়া হলো সম্রাটের ফরমানের কার্যকরী রূপদানের ব্যাপারটা। তার নৌ-জাহাজের কামানই অচিরে পর্তুগীজদের সঙ্গে ইংরেজের বিরোধের ফয়সালা করে ফেলে।

প্রথমতঃ নৌ-সৈন্য এসে তাদের বাণিজ্য জাহাজ সমষ্টিকে অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তি ও জলদস্যুদের হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করেছিল। পরে এই নৌ-সৈন্যের সাহায্যেই বৃটিশের পক্ষে সম্ভব হয় ভারতের মূল ভূখণ্ডের বুকে নিরাপদে পদ স্থাপন করা। এই নৌ-বিভাগের প্রথম সরকারী নাম রাখা হলো H. M. N. I. কোম্পানীর নৌ-বাহিনী, সেই নামই চালু থাকে ১৬৮৬ সাল পর্যন্ত। পর পর পাঁচবার পরিবর্ত্তনের পর, ১৯৩৪ সালে এর নামকরণ হল রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুখ্যতঃ পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদের মধ্য থেকেই এই সকল নৌ-সৈন্যদের সংগ্রহ করা হতো। কিন্তু এই সকল জাহাজের অফিসারদের পদগুলো অলঙ্কৃত করতো কেবলমাত্র বৃটিশ অফিসাররাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনিবার্য সঙ্কটের মুহূর্তেই বাধ্য হয়েছিল উনিশটি বিভিন্ন জাতীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে লোক গ্রহণ করতে। অফিসার পদে কিছু ভারতীয় স্থান পেলেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই সেনাবাহিনীকে রাখা হতো দেশের বৃহৎ জনসাধারণের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে। সৈন্য সংগ্রহ করার সময়ে রাজনৈতিক বিশ্বস্ততার বিষয় ছিল সৈন্য সংগ্রহকারী অফিসারদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয়। সামান্য প্রাথমিক ধরণের রাজনৈতিক সাহিত্যও রেটিং নৌ-সৈন্যের নাগালের বাইরে রাখা হতো। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যাদের ছিল সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ সংশ্রব, তাদের সম্মুখে রুদ্ধ ছিল সেনা বিভাগের প্রবেশ লাভ করার দ্বার। সুতরাং ১৯৪২ সালের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের "ভারত ছাড়ো" চরমপত্র সম্বন্ধে রেটিংরা ছিল নির্লিপ্ত—অবিচলিত।

যুদ্ধের অবসান আনে পরিস্থিতির পরিবর্তন। ১৯৪৫ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির লোকদের ভারতে ফিরিয়ে আনার সাথে সাথে দেখা দেয় দেশে প্রচণ্ড আলোড়ন—বিক্ষোভ। জাতীয়তাবাদী সংগ্রামী

নেতা সুভাষচন্দ্র আগেই পালিয়ে গিয়েছিলেন দেশ থেকে। যে সকল বৃটিশ ভারতীয় সৈন্যকে জাপান রেখেছিল বন্দী করে, তাদের নিয়ে গঠন করেন তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ। (Indian National Army.) লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা।

জাপানের পতন ঘটলো। তার কিছু বাদে রহস্যময় পরিস্থিতিতে হয় নেতাজী জীবনের অবসান। মহামান্য সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো এবং ভারত সম্রাটের সরকারের পতন ঘটাবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে, বৃটিশ কমাণ্ডার-ইন-চিফ অচিনলেক চেয়েছিলেন আই-এন-এ'র লোকদিগকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে

আজাদ হিন্দ ফৌজের আসন্ন বিচারের সংবাদে নৌ সৈন্যরা বা রেটিংগণ হয়ে উঠলো বিচলিত, চঞ্চল। ব্যারাক গুলোর আভ্যন্তরীণ অবস্থার চাপে পরিস্থিতি হয়ে উঠলো আরো বেশী সঙ্কটাপন্ন। যুদ্ধশেষে সামরিক কর্ম থেকে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত সৈন্যদের পুনঃ সংস্থাপনের বিষয়টির মোকাবিলা করার ব্যাপারে বৃটিশের প্রস্তুতির অভাব দেখা গেল। অতর্কিতে রেটিংদের হতে হলো বেকার হওয়ার নির্মম বাস্তবতার সম্মুখীন। মনে হলো প্রয়োজনের সময়ে যারা 'স্বেচ্ছায়' এগিয়ে এসেছিল সাম্রাজ্যের সেবা করতে, তাদেরই কল্যাণ সাধনে বৃটিশদের উৎসাহের অভাব রয়েছে। জাতীয়তাবাদীদের প্রচারের দাবী ছিল, উর্দিপরা লোকগুলো

বেতনভোগী ভাড়াটিয়া সৈন্য বৈ আর কিছু নয়। প্রমাণঃ হলো জাতীয়তাবাদীদের সেই অভিযোগেরই যথার্থতা।

ঘটনাবলীর এমনি কাঠামোর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে এমন এক শক্তি যে শক্তিকে পূর্বে কখনো দেখতে পায়নি আর-আই-এন এর রেটিং নাবিকেরা। একদল তরুণ ও দৃঢ়চিত্ত লোকেরা চেষ্টা করলো সে শক্তিকে দেশের স্বাধীনতা অর্জন কাজে নিয়োজিত করতে। আমি ছিলাম তাদেরই একজন। আমরা ছিলাম বহুদূরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন এলাকার সব লোক—ছিল ভিন্নভিন্ন ধর্মসংস্কৃতি। আমি ছিলাম বাংলা-দেশের, কেউ ছিল পাঞ্জাবের, কেউ বা ছিল আরো দূর উত্তর ভাগের লোক। দক্ষিণের লোকও ছিল সেখানে। আমাদের সবারই ছিল কমবেশী একই সামাজিক ব্যুৎপত্তির ইতিহাস। আমাদের কেউই জন্মগ্রহণ করেনি কোন রাজধানী বা সদর কেন্দ্রে। এমনকি, আর-আই-এন এ যোগদান করার আগে আমি চোখেও দেখিনি কোন ইংরেজকে। আমাদের লোকেরা গ্রাম দেশে বসবাস করতো। ইংলণ্ডের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নই আসেনা তাদের বেলায়। তাদের পরিবারের কোন কোন লোক কাজ করেছিল রাজার জন্য। তাদের সব সম্পদ বৃটিশের সাথে অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্রে বাঁধা ছিল। আমার পিতা এক সামান্য জমিদার ছিলেন, তখনকার সময়ের সে এক মস্তবড় ব্যাপার। আমার শিক্ষা আবদ্ধ ছিল আমাদের গ্রামের স্কুলের সীমার মধ্যেই।

তখনো নিজ জেলা সদরের চেয়ে কোনো বড় সহর চোখে দেখিনি। নৌ-বিভাগের কাজই আমার সামনে উন্মুক্ত করে দেয় বহির্জগৎটাকে। সেই অভিজ্ঞতাকে উপভোগ করতাম। যখন সৈন্য হিসেবে, ভর্ত্তি করা হয় আমাদের সবার বয়সই তখন বিশ বছরের তলায়। কিসে আমাদের মত বিশ্বস্ত সামরিক লোকেরা হয়ে উঠলো বিদ্রোহী? সে ছিল দীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্ন যুদ্ধের দিনগুলোর ঘটনা প্রবাহ। আমরা প্রায়ই দেখতে পেতাম, যখন আমরা বৃটিশ নাবিকদের পাশাপাশি কাজ করে যাচ্ছিলাম তখন সাদা সৈন্যরা পেতো পক্ষপাতমূলক ব্যবহার। নৌ-ঘাটির মধ্যেই হোক আর যুদ্ধ এলাকার মধ্যেই হোক, তাদের ছিল তুলনামূলক ভাবে ভাল খাবার, ভাল সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা। তারা চলাফেরা করতো অধিকতর আরামে। ইচ্ছা করলেই তারা ব্যবহার করতে পারতো আমাদের ক্যানটিন, মেসের কামরা, স্নানাগার ইত্যাদি। কিন্তু তাদের গুলিতে আমাদের কোন প্রবেশাধিকার ছিলনা। বৃটিশ সেনাদের প্রয়োজন হতো না আমাদের ভারতীয় কমিশনড অফিসারদের অভিবাদন জানাবার। আমরা যদি বৃটিশ অফিসারদের অভিবাদন না জানাতাম, তবে আমাদের জন্য হতো শাস্তির ব্যবস্থা। এই প্রভেদটা খুবই অমার্জিত অশিষ্ট ব্যপার ছিল। ছিল আমাদের মনে হীনতাবোধ জাগাবার জন্যই।

আমি ছিলাম একজন বেতার টেলিগ্রাফ কর্মী। আমি বোধ

করতাম, এই পদে সাদা চামড়ার যে কোন লোকের সমান যোগ্যতা নিয়েই কাজ চালানোর দক্ষতা ছিল আমার। দুই বৎসর ভারত মহাসাগরে এবং আটলান্টিক মহাসাগরে যুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত থাকার পরে মাউন্টব্যাটেন যে বিশেষ বাহিনী গঠন করেছিলেন, তাতে কম্বাইণ্ড অপারেশনের কাজে নির্বাচিত করা হয় আমাকে। আর-আই-এন থেকে প্রায় পঞ্চাশ জন বাছাই করা লোককে বিশেষভাবে হাতেকলমে শিক্ষা দিয়ে, তাদের নিয়ে B-21 নামে Beach Signal Unit গঠন করা হয়। আমরা প্রায় একবৎসর কাল কাটিয়েছিলাম বর্মাদেশের যুদ্ধে। সেখানে আমরা ভোগ করেছিলাম এমন পার্থক্য এবং ব্যক্তিগত অবমাননা যে বৃটিশ সৈন্যদের জন্য আমাদের আর বিন্দুমাত্র ভালবাসা অবশিষ্ট ছিলনা। প্রায়ই আমরা টমীদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠতাম।

বম্বেতে ফিরে আসার পথে আমি গভীর ভাবে ঐ সব ঘটনাই চিন্তা করে চলেছিলাম। গভীর জঙ্গলে অথবা বহুদূরের সমুদ্রতীরে, যে কোন ভাবেই হোক, বৃটিশের লোকদের জন্য যাতায়াতের যান, তাঁবু এবং গরম খাবারের ব্যবস্থা করা হোতো। প্রায়ই আমাদের জন্য কিছুই থাকতো না। বৃষ্টিতে কাদায়, অথবা অগ্নিবর্ষী ঝলসানো রোদে আমাদের কঠিন চেষ্টা করে জীবন রক্ষা করে চলতে হতো। কাজের ক্ষেত্রে কখনো তারা কর্মকুশলতায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত

করতে পারেনি। তাতেও তাদের বাধা হয়নি আমাদের "Incompetent Niggers" বা অযোগ্য কালো আদমী বলে ডাকতে। জাপানের পতনের পরে যখন আমি বম্বে ফিরে এলাম তখন সৈনিকের উর্দির প্রতি আমার আর কোন মোহই অবশিষ্ট ছিলনা। আমার তখন এসে গেছে অন্তর্দাহী রূপান্তর—সাম্রাজ্য রক্ষাকারীর গর্বিত ভূমিকা থেকে আমি তখন রূপান্তরিত হয়ে পড়েছি এক প্রাণহীন যন্ত্রবিশেষে। সে যন্ত্র নিযুক্ত রয়েছে নিজের দেশে বিদেশীর শাসনকে কায়েমীভাবে সুরক্ষিত করার কাজে।

জাপানের আত্মসমর্পনের পরে, আমাদের দলকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। আমরা বোম্বেতে তীরে অবস্থিত সিগন্যাল স্কুলে, H. M. I. S. 'তলোয়ারে' চলে এলাম। এই স্কুলটি ১৯৪১ সালে স্থাপিত হয়েছিল। সেখানে একই সময়ে প্রায় একহাজার সিগ্‌নেলিং রেটিংদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সিগনেল রেটিংগণ মোটামুটিভাবে শিক্ষিত। যুদ্ধের সময়ে 'তলোয়ার' ছিল খুব সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত এক শিক্ষণ সংস্থা। কিন্তু বর্মা থেকে ফিরে এসে, সেই সংস্থার যথেষ্ট অবনতি লক্ষ্য করলাম। অতিমাত্রায় ভীড়ের দরুণ নিয়ম শৃঙ্খলার মানের খুবই অধঃপতন ঘটেছে। রেটিংদের ব্যস্ত রাখার মত কোন শিক্ষায় কার্যক্রম অনুষ্ঠানই বর্তমান ছিলনা। প্রতিষ্ঠানটির অবস্থা পূর্বের চেয়ে অনেক কম পরিচ্ছন্ন। সৈনিকের কাজ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার বা নূতন

পদ লাভ করার অপেক্ষায়, প্রতি সপ্তাহে নূতন করে রেটিংগণ উপস্থিত হতে লাগলো দলে দলে। যুদ্ধ চলাকালে যে সব পুরাতন বন্ধু ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর চারদিকে, যুদ্ধের শেষে 'তলোয়ারে' এসে তাদের আবার সাক্ষাৎ ঘটলো। কারো কারো পক্ষে সেটাই ছিল শেষ সাক্ষাৎ।

একদিন আমার বন্ধু এস. এম. শ্যাম ফিরে এলেন মালয় থেকে। নিয়ে এলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচিত্র কাহিনী। মালয় অধিকারী সৈন্যদের সঙ্গে থাকার দরুণ তাদের সঙ্গে ঘটেছিল সাক্ষাৎ যোগাযোগ। তিনি এসেছিলেন প্রাক্তন আজাদ হিন্দ সরকারের কোন কোন সভ্যদের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে। সেগুলো ছিল জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষচন্দ্র বসুর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুর নিকটে লেখা চিঠি। কিছু কাগজপত্র এবং আলোকচিত্রও এনেছিলেন তিনি। এসব ব্যাপারে মাথা দেওয়া রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ বলে মনে করা হতো নৌ-বাহিনীতে। এ সকল চিঠি কাগজপত্র যথাস্থানে পৌঁছে দেবার গোপন কার্যকলাপে লিপ্ত থাকাকালে আমি জড়িয়ে পড়লাম এমন সব কাজে, যে কাজকে সরকারীভাবে বলা হতো অবৈধ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কিন্তু আমার তখনকার মানসিক অবস্থায় সেটা ছিল মহান মর্যাদাদায়ক। পরবর্তী সপ্তাহগুলিতে আমার জীবনের গতিপথের আমূল পরিবর্তন হোল। যে ধরনের লোকদের এড়িয়ে চলার শিক্ষা দেওয়া

হয়েছিল আমাদের, তাদেরই সংস্পর্শে এসে গেলাম আমি। দেখতে পেলাম তাদের চিন্তাধারার ওপরে রয়েছে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন।

আমার বয়স তখন বাইশ বৎসর। অক্ষতদেহেই আমি ফিরে এসেছি এক মহাযুদ্ধ সমাপ্ত করে। সেই যুদ্ধ ঘটিয়েছিল নাৎসি আধিপত্যের পরিসমাপ্তি। আমি নিজেকেই প্রশ্ন করতে সুরু করলাম, কী অধিকার ছিল বৃটিশের আমার দেশের ওপর রাজত্ব করার? জাতীয়তাবাদী ভারত বৃটিশকে বলেছিল, ভারতের ব্যাপার ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দিতে। সে ব্যাপারে বৃটিশরা ছিল তেমনি অনমনীয়। জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের কাছে আমাদের পরিচয় ছিল একমাত্র ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে। আমার বোধ হোলো আমরা যে তা নই সেটাই প্রমাণ করার ভার পড়লো আজ আমাদের ওপর। যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি হয়ে পড়লাম একজন ষড়যন্ত্রকারী।

আমি সহজেই আমার মত আরো লোকের সন্ধান পেলাম 'তলোয়ারে'। কিন্তু আন্দোলনকারীই হোক বা অন্য আর কিছু হোক যে কোন প্রকারের বৃটিশবিরোধী কাজ করা ছিল দুঃসাধ্য, অত্যন্ত বিপদজনক। নিরাপত্তা শাখার রেটিংরা বাস করতো আমাদের সঙ্গে আমাদের ব্যারাকেই। তাই প্রকাশ হয়ে যাওয়ার বিপদ এড়াতে গিয়েই আমাদের সবচেয়ে বেশী সময় নষ্ট হয়ে যেতো।

আমরা আমাদের নিজেদের বলতাম 'আজাদ হিন্দী' (স্বাধীন ভারতীয়)। নিয়মিত স্বাধীন আজাদ হিন্দীর সংখ্যা কুড়িজনের বেশী ছিলনা। সহানুভূতিসম্পন্নদের সংখ্যাও ছিল প্রায় ঐরকম। প্রস্তুত হলো এক ব্যাপক কার্যক্রমের নক্‌শা। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকারীদের মধ্যে ছিল কিছু কিছু জঙ্গী ধরণের লোক। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সে সব বামপন্থী নেতাদের কাছ থেকে আমরা পেলাম কিছু কিছু নির্দেশ উপদেশ। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তখনো আত্মগোপনকারীর জীবন যাপন করতেন। আমাদের মধ্যে তাঁদের নাগাল পাওয়া সম্ভব হতো, কেবলমাত্র কোনও মধ্যবর্তী লোকের মারফতে। আমাদের কর্মসূচী হলো: (ক) হেলাফেলা করে নোংরা নীতিতে সৈন্যদল ভেঙ্গে দিয়ে গুটিয়ে ফেলার দরুণ যেসব অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল, মুখে মুখে প্রচারের সাহায্যে সে সব অসন্তোষকে কেন্দ্রীভূত করে একই খাতে বইয়ে দিয়ে একপ্রকার চুপচুপ ফিসফিস অভিযান চালানো; (খ) জাহাজে ব্যারাকে বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করা; (গ) অন্তর্ঘাতী কার্যের মধ্যদিয়ে বৃটিশবিরোধী মনোভাব গড়ে তোলা। আর. আই. এন. এর অবশিষ্ট অংশে সামান্য ফলই লাভ করা গিয়েছিল। আমাদের অধিকাংশের ক্রিয়াকর্ম চলতো 'তলোয়ার' জাহাজে। সেখানে পড়ল আমাদের প্রচেষ্টার প্রচণ্ড প্রভাব।

'নৌ-দিবস' উৎসব পালন করার কথা ছিল ১৯৪৫

সালের ১লা ডিসেম্বর। সেবারই প্রথম আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল অসামরিক জনসাধারণকে। আমন্ত্রণ ছিল—জাহাজগুলো এবং তীরবর্তী প্রতিষ্ঠানগুলো দেখার জন্য। কর্তৃপক্ষ প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন, রীতিমত ভদ্রসন্তানদ্বারা গঠিত এক নাবিকগোষ্ঠি—পতাকা ও অন্যান্য উপাদানে সুসজ্জিত ফিট্‌ফাট্‌ জাহাজ সমষ্টি। প্রথমবারের মত সুযোগ নেওয়া হোলো আমাদের প্রতিভা পরীক্ষা করার। আগের রাতে করলাম কঠোর পরিশ্রম। ভোরবেলা 'তলোয়ার' হয়ে দাঁড়ালো একটা ধ্বংসস্তুপ। বিক্ষিপ্ত পোড়া পতাকা আর পতাকার কাপড়ে প্যারেড গ্রাউণ্ড জঞ্জাল হয়ে দাঁড়াল। বালতি আর ঝাঁটাগুলো রইলো সাড়ম্বরে দৃষ্টিগোচর হয়ে। প্রত্যেক দেওয়ালে একফুট উঁচু অক্ষরে লেখা রাজনৈতিক শ্লোগান্‌গুলো রইলো চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে। সেগুলো ছিল—"ভারত ছাড়ো," "সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক", "এখনই বিদ্রোহ করো" "গোরাদের হত্যা কর।" আসামরিক লোকদের সামনে ফটক খুলে দেবার আগে দিশেহারা কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করলো জায়গাটাকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে তুলতে। রেটিংদের মনে সঞ্চারিত হলো প্রবল উত্তেজনা।

নৌ-দিবসে আমরা একটা ছাপ রাখতে সমর্থ হলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই কাজের মধ্য দিয়ে নিজের পথ ও ভাগ্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল। ঘটনার পরে আমরা সরে যেতে অসমর্থ হলাম। বহুলোক আমাদের ওপর সহানুভূতি-

শীল ঔৎসুক্যে তাকিয়ে রইল, আমরা যেন প্রদর্শন করতে পারি আরো বড় আকারে বৃটিশ বিরোধী বিক্ষোভ। আর পেছোবার পথ নেই। 'তলোয়ারে' যে উত্তেজনার ভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে, নিতে হবে তারই সুযোগ। নূতন কিছু করতে হবে—করতে হবে এমন কিছু যাতে রেটিংদের কল্পনাতে ও চেতনায় আগুন ধরে যায়।

এই সময়ে আমাদের দলের একজন পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন—একটা উন্মাদের মত কাজ। নৌ-বাহিনীর লোকদের পদত্যাগ করার অধিকার কোথায়? আবেগ-প্রবন আর, কে, সিং-কে একটা কিছু করতেই হতো। এক স্বপনবিলাসী যুবক। গান্ধীবাদে বেশী অনুরক্ত হয়ে, তিনি খোলাখুলি ভাবে বৃটিশরাজকে অগ্রাহ্য করার পক্ষপাতী ছিলেন। আমাদের মত ঢাক্‌ঢাক্ গুড়্‌গুড়্ নীতিতে এবং ষড়যন্ত্রমূলক প্রচেষ্টার ওপরে নির্ভর করাতে ছিল তাঁর ধৈর্যের একান্ত অভাব। দর্শনীয়ভাবে আর, আই, এন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন আমাদের সাহায্য করতে। সেটাই ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব।

যখন কমাণ্ডিং অফিসারের সামনে তাঁকে আনা হলো, তখন সিং তাঁর মাথার টুপী ছুঁড়ে মাটির ওপরে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে লাথি মারলেন। প্রকাশ পেলো, রাজমুকুট এবং রাজার সৈনিকের কাজের প্রতি তাঁর একান্ত অবজ্ঞা ও ঘৃণা। রেটিংরা উল্লাস প্রকাশ করলো। কিন্তু বৃটিশ অফিসাররা

উঠ্‌লো আগুন হয়ে। সিংএর লাভ হলো, তিন মাসের কারাবাসের শাস্তি। অনেক রেটিংদের কাছে সিং হয়ে পড়লেন একজন শহীদ। সাহসে তাঁর সমকক্ষ হবার জন্য রেটিংদের মনে আকাঙ্খা জাগলো।

দিন দিন আমাদের সাহস বেড়েই যেতে লাগলো। কিন্তু আমাদের কর্মীর সংখ্যা কমতে লাগলো। চালু রাখা হলো ছোট ছোট ঘটনার প্রবাহ। সে সব ঘটনার প্রত্যেকটি ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাতে প্রভুরা হয়ে পড়লো আরো বেশী সতর্ক। কিন্তু তাতে আমাদের প্রতি অনুগত রেটিংদের সংখ্যা বাড়তেই লাগলো। নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হলো আরো বেশী জোরদার। ফলে আমাদেরও আরও বেশী সতর্কতা অবলম্বন করতে হতো। কারণ আমরা আর নিশ্চিত ছিলাম না, কাকে বিশ্বাস করতে হবে। আমাদের মধ্যে যারা সন্দেহজনক বলে কর্তৃপক্ষের মনে হলো, তাদের খুব তাড়াতাড়ি নৌ-বাহিনী থেকে ছাঁটাই করা হলো।

১৯৪৬ সালে ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে কমাণ্ডার-ইন-চিফ-এর 'তলোয়ার' পরিদর্শনে আসার খবর যখন ঘোষণা করা হলো, তখন আমাদের এই ষড়যন্ত্রকারী কর্মিদের সংখ্যা আধ ডজনের বেশীও ছিলনা। সেটা ছিল তাঁর পক্ষে প্রথমবারের 'তলোয়ার' পরিদর্শন। আমরা স্থির করলাম, 'নৌ-দিবসেতে' আমরা যা করেছিলাম এই উপলক্ষে তার চেয়ে আরো ভালভাবে কাজ প্রদর্শন করতে হবে।

শ্লোগান এবং অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ নিবারণের জন্য কর্তৃপক্ষ সবরকম সতর্কতাই অবলম্বন করলেন। রাতের পাহারার ব্যবস্থা আরো তীব্র করা হলো। প্যারেড্ গ্রাউণ্ডগুলোর ওপরে ফ্লাড লাইট্ বসানো হলো। 'তলোয়ারে'র ওপরে অন্ধকার নেমে এলে আমরা বোধ করতে পারলাম চাপা উত্তেজনা। আমাদের মর্যাদার তখন হলো সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। আমরা আমাদের লক্ষ্যবস্তুকে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হ'লাম। ভারতীয় সন্ধ্যার স্তিমিত আলোর সুযোগ নিলাম। যে বেদীর ওপরে দাঁড়িয়ে কমাণ্ডার্ ইন্-চিফ্ অভিনন্দন গ্রহণ করবেন, সেই বেদীর ওপরে 'জয়হিন্দ' এবং 'ভারত ছাড়ো' লিখে রাখা হলো। চলাফেরা করা ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল বলে আমাদের বেশীর ভাগ লোকই সরে পড়লো। আমি ছিলাম একজন সিনিয়ার রেটিং।

আমার উপর সন্দেহ তখনও পড়েনি কর্তৃপক্ষের। তাই যতটা সম্ভব একাই করবার জন্য আমার ওপরেই দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ব্যারাকের দেওয়ালে আরো কিছু শ্লোগান লিখে এবং আরো কিছু রাজদ্রোহী প্রচারপত্র সেঁটে দিয়েই আমাকে সন্তুষ্ট হতে হলো। ভোরবেলা প্রহরীরা এসে আবিষ্কার করলো সেগুলো। তৎক্ষণাৎ সমগ্র ব্যারাকটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাসী করার হুকুম দেওয়া হলো।

কেমন করে কী করা যায় এই নিয়ে রাতের পর রাত বসে বসে কাটিয়েছি-চোখে ঘুম নেই-তাই ছিলাম ক্লান্ত অবসন্ন।

ক্যাসেল ব্যারাক—বাইরের গেট
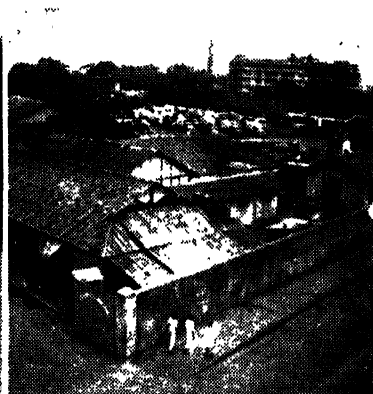
তলোয়ারের পরিবহন সংস্থায় পরিবর্তন

ক্যাসেল ব্যারাক—সামনের গেট
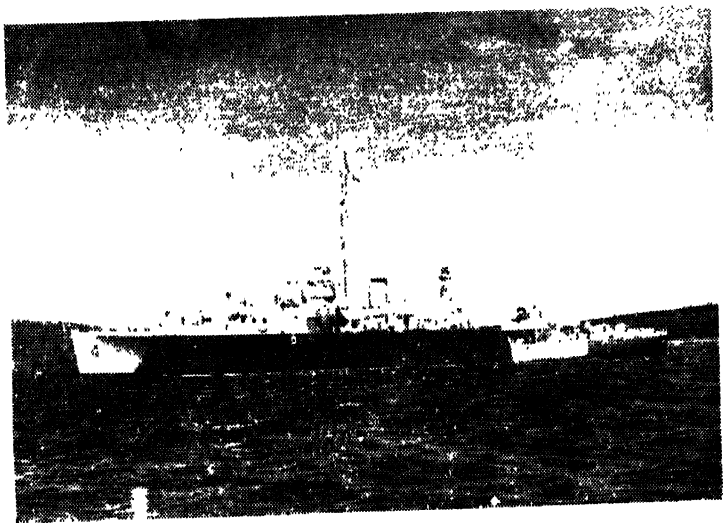
এইচ. এম. আই. এস. নর্মদা

যে সময়ে আমার কাজ শেষ হোলো, তখন প্রভাতের আলো সবে ফুটে উঠেছে দিগন্তে। আমার পক্ষে সব জিনিসগুলো লুকিয়ে ফেলা বা হাত সম্পূর্ণ ধুয়ে ফেলে পাহারাদারদের সম্পূর্ণ ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হলো না। এতই শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে অনবধানবশত একাধিক সূত্র ফেলে এলাম পিছনে। সেই সূত্র ধ'রে অনতিবিলম্বে তারা আমার সন্ধান পেলো। সমাজতান্ত্রিক নেতা অশোক মেটার "ভারতীয় বিদ্রোহ—১৮৫৭" এর অনুলিপি, আমার ডায়েরী এবং কতগুলি দোষারোপকারী চিঠি কেড়ে নিল আমার দেরাজ থেকে। আমাকে গ্রেপ্তার করল। এবং এইভাবে আরো কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হলো। আমার অপরাধের গুরুত্ব, হঠাৎ আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। বেয়নেটধারী সান্ত্রীদের দেখে আমি ভয়ে প্রায় সঙ্গাহীন হয়ে পড়লাম। কিন্তু যখনই আমি দেখতে পেলাম যে পাহারা দিয়ে নির্দোষ লোকদের ব্যারাক থেকে বের করে আনা হচ্ছে, তখন বিস্ময়করভাবে আমার ভয় তিরোহিত হোল। গ্রেপ্তারকরা লোকদের মধ্যে ছিল, আমার সেই বন্ধু যে মালয় থেকে চিঠিগুলো এনেছিল গুপ্তভাবে চোরাই পথে। যখন আমার ভয় দূর হয়ে গেল, আমি আমার অবস্থাটা পরিষ্কার দেখতে পেলাম। আমি হয়ে পড়লাম একজন মূল্যবান কয়েদী। এ সম্ভাবনাও ছিল যে আমি রেটিংদের সম্মুখে একজন বীর নায়করূপে প্রতিভাত হয়ে উঠবো। হয়তো, আমার এই

২

নূতন মর্যাদাই আমাদের উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত করে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

*

বোম্বাইয়ের জাতীয়তাবাদী সংবাদ পত্রগুলিতে খবর পাঠাবার জন্য আমরা একপ্রকার আদান প্রদানের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলাম। তার প্রয়োজনের সময় এসে গেল। আমাকেই বিশিষ্ট ভূমিকা নিতে হবে। মশাল বইতে হবে আমাকেই। আমার পক্ষে প্রচারের যতটুকু সম্ভাবনা আছে তা দেখতে হবে। সেই প্রচারের সুযোগ থেকে সবচেয়ে ভাল ফায়দা ওঠানোর ব্যাপারটা নির্ভর করলো আমার ওপরেই। একাকী অন্ধকার খুপরীর (cell) নির্জনতার মধ্যে আমি মনস্থির করে ফেললাম। পরে হয়ে পড়লাম গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

তার ছয় ঘণ্টা পরে অচিন্‌লেক্ এসে চলে যাওয়ার পরে সান্ত্রী আমাকে জাগিয়ে তুললো। কমাণ্ডিং অফিসারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে। আমার মনের দিক থেকে আমি আর তখন আর. আই. এন. এর একজন রেটিং ছিলাম না। কল্পনায় আমি তখন একজন 'আজাদ হিন্দী' বন্দী।

আমাকে যখন পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল সি-ও- (C. O.) এর অফিসে, তখন 'তলোয়ারে'র সমস্ত অফিসারই সমবেত হয়েছিল সেখানে। যে ভারতীয় লেফটেনাণ্ট

আমাকে চিহ্নিত ক'রে দেখিয়ে দিয়েছিল, সে তখন হাসলো কপট চটুল হাসি। আর. আই. এন এর কমাণ্ডিং অফিসার কমাণ্ডার কিংকে দেখে মনে হলো যেন একটি ঘূর্ণিবাত্যার কেন্দ্রবিন্দু—ঝড়ের আগের শান্ত অবস্থা। আমাকে পোকার মত কিলবিল করে ধরার সব বন্দোবস্তই আগেভাগে করে রাখা হয়েছিল। ভয়ানক কিছু আমার কপালে আছে এমন ভাব প্রকাশ করে তিনি বললেন "তাহলে তুমি-ই ;" দেখে মনে হলো যেন আমাকে ছোঁ মেরে ধরার জন্য বসেছিলেন। লেফটেনাণ্টকে মনে হলো, যে সব সন্দেহাতীত প্রমাণ তিনি সংগ্রহ করে রেখেছেন তা দিয়ে আমাকে পর্য্যুদস্ত করার জন্য তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। ওরা নিশ্চিত ছিল যে, এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য আমি মিথ্যার আশ্রয় নেবো। কিন্তু আমি আমার সঙ্কল্পে স্থির থাকলাম। কিং গর্জে উঠলেন ঃ "তোমার কার্যকলাপের পরিণতি কি, তাকি তুমি জান ?"

"শান্ত থাকো—তোমার গোলাবর্ষণকারী দলের সম্মুখীন হ'তে আমি প্রস্তুত।"

আমার কল্পনায় স্বাধীন ভারতের একজন সৈনিকের পক্ষে শত্রুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে যতটা নির্ভীকভাবে বলা সম্ভব ততটা নির্ভীকভাবেই আমি এই কথাগুলো বললাম। নিয়মকে নস্যাৎ করে শান্তভাবে আমি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লাম। পরিস্থিতিটা চলে গেল অ্যাডমিরেলটির

নিয়মধারার আয়ত্তের বাইরে। এটা ছিল একান্ত কল্পনাতীত। দৃশ্যতঃ প্রত্যেকেই হতবুদ্ধি ও চূড়ান্ত অপমানিত হলো। তারা বুঝতে পারলোনা এর পর কোন ভূমিকা তারা গ্রহণ করবে। আমার ভূমিকা সাঙ্গ হলে আমি সম্পূর্ণ শান্তি বোধ করলাম।

কমাণ্ডার কিং বেদী থেকে নেমে এসে আমার সঙ্গে সামনা সামনি কথা বলতে চেষ্টা করলেন। আমি বললাম— আমি তাঁকে বাধিত করতে পারব না।

তারপর তাঁর পক্ষে আর কিছুই করার রইলোনা। রাজনৈতিক অবস্থা ছিল যথেষ্ট খারাপ। আর-আই-এন এর মধ্যে নিজ হাতে একটি শহীদ তৈরী করার মত সাহস তাঁর ছিলনা। তাই তিনি স্থির করলেন ব্যাপারটাকে উচ্চতর নৌ কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করবেন। আমাকে আবার সেলে ফিরিয়ে নেওয়া হলো।

পরের দিন আমার গ্রেপ্তারের খবর প্রথম পাতায় প্রকাশ পেলো বোম্বাইয়ের সংবাদ পত্রগুলিতে। কমাণ্ডিং অফিসারের সম্মুখে আমার বীরত্বের কাহিনীর অতিরঞ্জিত বর্ণনা 'তলোয়ারে'র আরো অনেককে এককভাবে অনেক অন্তর্ঘাতী কার্য করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। আমার সঙ্গীদের কয়েকজন যারা তখনো ছিল 'তলোয়ারে', তারা তখন গোপন আন্দোলনকে আরো সুবিধাজনকভাবে জোরদার করার সুযোগ পেয়েছিল। সর্বত্রই শ্লোগান

লিখিত দেখতে পাওয়া গেল। একদিন 'তলোয়ারে'র কয়েকটি গাড়ী অসাবধানতাবশত চারপাশে চকচকে বৃটিশবিরোধী শ্লোগান বহন করেই সহরের ভিতর দিয়ে চলে গেল। তাতে কর্তৃপক্ষ হয়ে পড়ল খুবই উদ্বিগ্ন। এই গাড়ীগুলো সাধারণতঃ সকালের দিকে বেরিয়ে আসতো সহরের বাইরের ডিপো থেকে দুধ ও রেশনের জিনিস আনতে। শ্লোগানগুলো চিত্রিত করা হয়েছিল রাতেই। এমনকি কমাণ্ডার কিং এর গাড়ীও নজরের বাইরে যেতে পারেনি। আরো বেশী বুদ্ধিমান লোক হলে, সে হয়তো চেষ্টা করতো আরো কৌশলের সাহায্যে নিয়মশৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে পরিস্থিতিকে সামলে নিতে। কিন্তু কিং ছিল পুরাতনপন্থী। যুদ্ধ পূর্ব নৌবিভাগের আবহাওয়াতে মানুষ, লম্বা জমকালো জবরদস্ত কিং ছিল বেশ দক্ষ অফিসার। সে সময়কার অশিক্ষিত রেটিং দ্বারা পুষ্ট নৌবিভাগের আবহাওয়ায় সে ছিল একজন বেশ মানানসই অফিসার। তাদের মত লোকই ছিল আগেকার বৃটিশভারতের যুদ্ধ বিভাগের মেরুদণ্ড। তারাই ছিল কিপ্লিং এর ভারতের কঠিন, একগুঁয়ে, রোদে পোড়া তামাটে বর্ণের অবিচল নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের প্রতীক—তারাই গর্ব বোধ করতো ভারতের ব্যাপারে সর্বজ্ঞ বলে। তারা এ দেশকে ভালবাসতো নিজেদের কায়দায় কিন্তু তারা জানতে চায়নি দেশের লোকদের। নূতন রাজনৈতিক ভারতবাসী ছিল কিংএর

কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমাদের ভাষা জানবার মত স্থৈর্য ছিলনা তাঁর। আমাদের চিন্তাধারার তাৎপর্য উপলব্ধি করা ছিল আরো দুঃসাধ্য।

ফেব্রুয়ারীর আট তারিখে তিনি যাচ্ছিলেন ব্যারাকের পাশ দিয়ে। তখন শুনতে পেলেন কয়েকটি রেটিং ডব্লিউ-আর-আই-এন দের (আর-আই-এন এ ভারতীয় মহিলাশাখা) লক্ষ্য করে বিড়ালের ডাক ডাকছে। এই অস্বাভাবিক আচরণের হেতু খোঁজার জন্য অপেক্ষা না করেই তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। চিন্তা করে দেখলেন না, কেন 'তলোয়ারে'র এই শিক্ষিত রেটিংগণ এরকম ইতরপনায় মত্ত হয়ে উঠলো, যাদের আচরণে পূর্বে কখনো এরূপ দোষ দেখা যায়নি। টমী ও সাদা অফিসারদের কাছে মোহিনীরূপ দেখাতে গিয়ে আর-আই-এন এর মহিলারা অবমাননা ঘটিয়েছিল রেটিংদের প্রতি। সাধারণভাবে বলতে গেল, রেটিংরা ঘৃণা করতো এদের সবাইকে। ঝড়ের বেগে ব্যারাকে প্রবেশ করে, কিং নিজেই অপরাধীদের সনাক্ত করতে চেষ্টা করলেন। দোষীলোককে চিনতে না পেরে তিনি প্রত্যেককেই কশাঘাত করে তীব্র ব্যাঙ্গোক্তিতে ফেটে পড়লেন: "তোমরা মাদী-কুকুরের বাচ্চা, কুলীর বাচ্চা, অসভ্য জংলীর বাচ্চা।" (you sons of bitches, sons of coolies, sons of bloody junglees)। এরপরে এনকোয়ারী কমিশনের কাছে, তাঁর সেই উক্তি তিনি মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু দাবী

করেছিলেন, তিনি যা বলেছিলেন তা ছিল নৌবিভাগের স্বাভাবিক আচরণ, "normal naval manner।"

যদিও আমি ছিলাম সেলে, তথাপি ব্যারাকের ঘটনাবলী সবই আসতো আমার কানে। এমনকি আমার প্রহরীদের কাছেও আমি হয়ে উঠলাম এক বীর সন্তান। রেটিংরা টগবগ করছিল রাগে। আমি তাদের উপদেশ দিলাম, অপমান হজম না করে তারা যেন শান্তভাবে প্রতিবাদ জানায়। সঙ্ঘবদ্ধ অভিযোগকে বিবেচনা করা হতো বিদ্রোহ বলে। তাই চৌদ্দজন রেটিং পৃথকভাবে অভিযোগ পেশ করলো একজিকিউটিভ অফিসার লেফটেনাণ্ট কমাণ্ডার 'শ' এর নিকট, কমাণ্ডার কিং এর ভাষার প্রতিবাদ করে। তিনি আবার ব্যাপারটা পাঠিয়ে দিলেন কিং এর কাছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব, 'শ' বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। ব্যক্তিগত এক চিঠিতে তিনি চেয়েছিলেন কিংকে সচেতন করে দিতে। কিন্তু কিং গ্রাহ্যই করলেন না। শুনানীটা স্থগিত রেখে দিলেন প্রার্থনা শুনানীর নিয়ম মাফিক দিন পর্যন্ত—to his normal day for hearing requests." ফেব্রুয়ারীর ১৬ তারিখে যখন অফিসের কানুন মাফিক শুনলেন তাদের অভিযোগ, তখন তিনি তাদের উল্টে দোষী সাব্যস্ত করে ছাড়লেন "মিথ্যা অভিযোগের" দায়ে। বিবেচনা করার জন্য চব্বিশঘণ্টার সময় দেওয়া হলো। সে উপদেশকে রেটিংরা গ্রহণ করলো ভীতি প্রদর্শনরূপে।

সেই একই দিনে ঘটেছিল কিং‌এর সামনে আমাকে নিয়ে আসার ব্যাপারটা। আমাকে সরকারীভাবে জানিয়ে দিলেন যে, ভারত সরকার স্থির করেছে আমার পদাবনতি ঘটিয়ে আমাকে আর-আই-এনের কাজ থেকে বরখাস্ত করা হবে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী সোমবারের আগে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত হবেনা। আমাকে জানানো হলো আমি ইচ্ছা করলে কমাণ্ডিং অফিসার এর যে সরকারী নিবাসটি খালি পড়ে আছে তাতেও থাকতে পারি, আবার ইচ্ছা করলে রেটিংদের ব্যারাকেও থাকতে পারি। সেটা আমার পছন্দের ওপর ছেড়ে দেওয়া হল। ব্যারাকই আমি পছন্দ করলাম।

সেলে পনরদিন কাটিয়ে আমি যখন ফিরে এলাম 'তলোয়ারে' তখন আমার পুরাতন সঙ্গীদের মধ্যে সবাইকেই সরিয়ে ফেলা হয়েছিল, কোন না কোন অজুহাতে। আমার মিললো চব্বিশ ঘণ্টার অবকাশ। কিছুক্ষণের জন্য আমি অবসন্ন হয়ে পড়লাম। মনে হলো, বৃথাই আমাদের সব চেষ্টা। অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী জাতীয়তাবাদী ভারতবাসী রাজনৈতিক আন্দোলন করে চলেছে। কখনো নির্ভর করেনি আমাদের উপরে—তাদের হিসেবের মধ্যে ছিলাম না আমরা কখনো। দেশের স্বাধীনতার কাজে, আমরা চেয়েছিলাম আমাদের সামান্য অংশ গ্রহণ করতে। আমরা প্রমাণ রাখতে চেয়েছিলাম, আমরাও এই মাটির সন্তান। তাই

আমাদের স্বপ্ন ছিল নৌবহর অধিকার করে জাতীয়তাবাদী নেতাদের হাতেই সমর্পন করবো। সে সময়ে সাধারণ সর্বস্তরের অসন্তোষ এমন অবস্থায় এসে ঠেকেছিল যে, তখন প্রয়োজন ছিল শুধুমাত্র একটু ধাক্কা মারার। কিন্তু আমার সময় ছিল অত্যন্ত সামান্য—সঙ্গীহীন, হতাশ অবস্থা।

আমাকে সঙ্গীহীনতার নিরাশা ভোগ করতে হয়নি। ব্যারাকে ফিরে আসার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য রেটিং এল আমাকে অভিনন্দন জানাতে। রাজনৈতিক অপরাধী বলে, সাধারণ অবস্থায় আমাকে বেশ তফাতেই থাকতে হতো। কিন্তু তারা বেশ খোলাখুলিভাবেই এসে আলাপ করতো। আমার আর কিছুই খোয়াবার ছিলনা—কোন কিছুরই ভয় ছিলনা আমার। তাদের বেলায় ছিল ভিন্ন কথা। কিন্তু মনে হলো, তারাও আর এখন ওসব গ্রাহ্য করে না। তারা আমাকে বললো আই-এন-এ বন্দীদের বিচারে ডিফেন্সের প্রয়োজনে রেটিংদের কাছ থেকে প্রকাশ্যভাবেই দান সংগ্রহ করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনাটি আমরা আজাদ হিন্দী হয়ে একান্ত সঙ্গোপনে শুরু করেছিলাম। দিল্লীতে পরাক্রান্ত মোগলদের লালকেল্লায় আই-এন-এন এর নেতাদের বিচার চলেছে। 'তলোয়ারে'র রেটিংরা প্রকাশ্যেই তাদের আত্মরক্ষা ভাণ্ডারে দান করে যাচ্ছিল। কর্তৃপক্ষ, যাহোক চোখ বুঁজে আছে। এ খবরটা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। এই আবহাওয়ায় অনেক কাজের

কাজ করা সম্ভব। সেই রাতেই এক গোপন সভা করার প্রস্তাব নেওয়া হল। সে সভায় খসড়া তৈরী করা হবে সংগ্রামের।

আমাদের উদ্দেশ্য নিয়ে কোন দ্বিমত ছিলনা। আর-আই-এন দখল করে তুলে দেওয়া হবে নেতাদের হাতে। সে সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে রাজনৈতিক ভারতকে নিয়ে যে টানাটানি চলছিল তা আমাদের জানা ছিলনা। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দাবী, তারা সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিনিধি। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে তারা বৃটিশকে সতর্ক করে বলে দিয়েছিল "ভারত ছাড়ো"। এদিকে মুসলমানদের সর্বপ্রধান সংগঠন, 'মুসলিম লীগ' দাবী করে যাচ্ছিল তাদের সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক বাসভূমির।

আমরা ছিলাম অল্পবয়স্ক ও অনভিজ্ঞ, আর আমাদের রাখা হয়েছিল এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করে যে, ব্যারাকের দেওয়ালের বাইরে কি সব রাজনৈতিক নাটক ঘটে যাচ্ছিল তা আমাদের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব ছিলনা। আমাদের আদর্শবাদ ছিল অত্যন্ত উচ্চ, ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের মনোভাব ছিল অত্যন্ত জোরদার। আমার মনে আছে, আমি যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলাম: "বৃটিশ চলে গেলে এবং বৃটিশের 'বিভেদ করে শাসন করো' নীতির অবসান ঘটলে, আমরাই আমাদের বিষয় মিটিয়ে ফেলতে পারি।" সে রাত্রে যারা সমবেত হয়েছিল তারা সবাই ছিল আমার

সঙ্গে একমত। কিন্তু আমরা এখন করব কী? কি করে শুরু হয় একটা অভ্যুত্থান? যুক্তি আর চিন্তায় ভর করে আমরা জেগে বসে কাটালাম সারারাত। পরিস্থিতি আরো বিশদভাবে বুঝে নেবার উদ্দেশে আমরা সভা ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়লাম ভোরের আগে। সবাকার সমবেত পর্যবেক্ষণের পটভূমিকায়, পরের রাতে নেওয়া হবে চরম সিদ্ধান্ত।

১৭ই ফেব্রুয়ারীর রাত। আবার মিলিত হয়ে স্থির করা হলো একটা কাজের ধারা। মহাত্মা গান্ধীর বিখ্যাত ডাণ্ডীর লবণ পদযাত্রা দেখা দিল আমাদের কাছে একটা চমৎকার পদ-প্রদর্শকের আকারে। সে সময়ে, তুচ্ছ অথচ সর্বব্যাপী লবণ শুল্ককে অমান্য করেছিলেন গান্ধীজী। লবণ তৈরী করার আইনকে ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন ডাণ্ডী সমুদ্রতীর অবধি পায়ে হেঁটে। লবণ গিয়ে স্পর্শ করলো প্রতিটি মানুষের প্রতিদিনের জীবন প্রবাহকে। জেগে উঠলো সমগ্র ভারত। তাতে দেখা গেল একটা নিশানা। ব্যারাক জীবনের এমন এক বিষয়কে বেছে নিতে হবে যাতে প্রত্যেকটি রেটিং জড়িত আছে। যে খাবার দেওয়া হতো তাদের, সে শুধু খারাপই ছিলনা—ছিল অরুচিকর ও অখাদ্য। সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, খারাপ খাদ্যের বিরুদ্ধে 'তলোয়ারে'র রেটিংদের উত্তেজিত করতে হবে। খাবার গ্রহণ অস্বীকার করতে হবে। তাহলে, তাকেই শারীরিক শাস্তি পাবার মত অপরাধ বলে গণ্য করা হবে—মনে করা হবে বিদ্রোহ

প্রয়োজন শুধু একবারের মত নিয়মানুবর্তিতার শৃঙ্খল ছিন্ন করা। সব রকমে জ্বলে ওঠার পক্ষে 'তলোয়ার'-এর অবস্থা ছিল যথেষ্ট বিস্ফোরক। সেই মুহূর্তের বীর ছিলাম আমি। পরের দিন সকালে আমার কাছ থেকে খাবার খেতে অস্বীকার করার ডাক উঠলে, সে ডাকের বিশেষ গুরুত্বলাভ করারই ছিল সম্ভাবনা। আমরা যদি নেতৃত্বের ব্যবস্থা করতে সমর্থ নাও হতাম, তবুও একবার আগুন ধরিয়ে দিলে অবস্থার চাপই সৃষ্টি করতো নির্দেশ দেবার মত নেতা, যতক্ষণ না জাতীয় নেতারা সেই নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করছেন।

আমাদের চিন্তাধারা সেই ধরণেরই ছিল। দুই ধরণের নেতৃত্বের বিরাট পার্থক্যের কোন অর্থই ধরা পড়েনি আমাদের কাছে। আমার একটা অস্পষ্ট ধারণা হল যে এই রাতটাই আর.আই.এন. এতে আমার শেষ রাত—। সেই ধারণার বশে আমি লেগে গেলাম অন্যান্য লোকের সঙ্গে কাজে। পরে দেখা গেল, সেটাই ছিল আমার পক্ষে গোপন আন্দোলনের শেষ অধ্যায়।

*

১৯৪৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ভোর পাঁচটায় নিয়ম-মাফিক এইচ.এম.আই.এস. 'তলোয়ার'-এর রেটিংদের জাগিয়ে তোলা হলো। সকাল ৮টায় তারা চলে গেল প্রাতরাশের জন্য মেসের কামরাগুলোতে। সংখ্যায় তারা পনের-শতেরও বেশী। হঠাৎ চাপা গুঞ্জন উঠলো। কে শুরু করেছিল,

কেউ সঠিক ধরতে পারলো না। শীঘ্রই চারদিকে শোর-গোল। কয়েক মিনিটের মধ্যে লোকগুলো বেরিয়ে এলো মেস হলের বাইরে। খাবেনা তারা—খাবার নিকৃষ্ট, অপর্যাপ্ত। কোথা থেকে শ্লোগান উঠলোঃ "No food, No work—না খাবার, না কাজ।" আমরা সীমা ছাড়িয়ে গেলাম।

কর্তৃপক্ষ হতভম্ব। এর আগে আর.আই.এন.-এতে কখনো এমন ঘটেনি। দুজন ছোটদরের অফিসার ঘুরে দেখতে এলো ব্যাপারটা কী। আমাদের চোখে ভারতীয় অফিসাররা তাদের সাদা প্রতিরূপের চেয়ে কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ ছিলনা—ব্যতিক্রম কদাচিৎ। এদের অধিকাংশই ছিল ভারতীয় সমাজের রাজভক্ত স্তরের লোক। অধিকাংশ বৃটিশ অফিসারের মত, তারাও পছন্দ করতো রেটিংদের যেন কোন উন্নতি না হয়। তাদের অবস্থার পরিবর্তন না আসে। তাদের ভয়—রেটিংদের কাছে জনপ্রিয় হলে ঊর্দ্ধতন বৃটিশের কাছ থেকে পাওয়া তাদের সুযোগ সুবিধা হারাতে হবে। রেটিংদের অবজ্ঞাসূচক আওয়াজে পালাতে হলো সেই দুজন অফিসারকে। পুরো পাঁচ ঘণ্টা কেটে গেল। আমাদের আর ঘাঁটাতে এলেন না কর্তৃপক্ষ। (এখানে সেই রেটিংদেরই উল্লেখ করা হয়েছে যারা 'তলোয়ার'-এ ঝড় ওঠার আগের দু'রাতে আমার সাথে জড়ো হয়ে বসে ষড়যন্ত্র করেছিল। আমাদের সকলের একই আবেগ ও কামনা ছিল।) আমরা

ব্যক্তিগতভাবে ও দলগতভাবে আলোচনা করলাম। প্রতিটি মুহূর্ত্ত ছিল অত্যন্ত মূল্যবান।

আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল—রেটিংদের উপলব্ধি করাতে হবে যে এটা শুধু খাদ্যের লড়াই নয়। সেকথাই তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। তাদের বর্তমান অবস্থা খারাপ, ভবিষ্যৎ আরো খারাপ। এবং বৃটিশ যখন তাদের ছাড়াই চলতে পারে, তখন কোন সৌজন্যের তোয়াক্কা না করেই তাদের রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেবে। দেশের লোকদের পক্ষে রেটিংদের প্রতি কোন আসক্তি থাকার সঙ্গত কারণ ছিলনা। তাদের কাছে রেটিংরা ভাড়াটে, "Hired assassins for the Empire"—সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ভাড়াটে হন্তারক। "Fighters for the continued bondage of India"—ভারতের চিরবন্ধন রক্ষাকারী প্রহরী। কিন্তু শেষ মুহূর্তে একটা সুযোগ পেয়েছে রেটিংরা এই অপবাদ স্খালনের। তারা যোদ্ধা। তারাও হতে পারে ভারতের স্বাধীনতা আনয়ন করার হাতিয়ার। সমবেত প্রচেষ্টায় ব্রতী হলেই তারা আর.আই.এন. দখল করতে সমর্থ হবে। তখন জাতীয় নেতারাই বলে দেবে—কি করতে হবে। জাতীয় নেতারা বছরের পর বছর যা করার জন্য শ্রম করে চলেছিল, বস্তুতঃ রেটিংরা তাই করতে সমর্থ হবে। তফাতের মধ্যে কাজটা কয়েকদিনের মধ্যেই সম্পন্ন হবে।

সন্দেহ নেই, পাকাপোক্ত হাতে-কলমে রাজনীতি

অভিজ্ঞদের কানে এসব বোকার মতই শোনাবে। কিন্তু যাদের বেশ বিজ্ঞ বলে মনে হয়েছিল, তাদের এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। যারা আমাদের কাছে যুক্তি দেখিয়ে তর্ক জুড়েছে, আমরা তাদের এড়িয়েই চললাম। সৌভাগ্যের বিষয়, তাদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। কারণ, গত কয়েক মাসের আন্দোলনমূলক কাজের মধ্যেই আমাদের কিছু শিক্ষালাভ হয়েছিল। যাদের একটা অতীত রাজ-নৈতিক ইতিহাস আছে—তাদের এড়িয়েই চলতে হতো। কারণ তাদের আছে পাণ্ডিত্যের অভিমান, আছে পুঁথিগত মতবাদ। অপ্রয়োজনীয় তর্কাতর্কি করে সমস্ত সুসংবদ্ধ কাজকে পণ্ড করে দিতে তারা ওস্তাদ। আমাদের আবেদন ছিল সরল রেটিংদের মূল ভাবাবেগের কাছে। তাই আমরা সফল হয়েছিলাম।

প্রায় দুপুর ১টার সময়ে 'তলোয়ার'-এ ছুটে এলেন ফ্ল্যাগ অ'ফসার-রিয়ার এডমিরাল র‍্যাটরে (Rear-Admiral Rattray—Flag Officer)—বম্বের সবচেয়ে বড় নৌ-বাহিনীর অফিসার। সোজাসুজি রেটিংদের কাছে এসেই প্রস্তাব করলেন, কমাণ্ডার কিং-কে বদলী করে আনবেন ক্যাপ্টেন ইনিগো জোন্‌স্‌কে (Inigo Jones)। এমনকি খাদ্যের প্রশ্নকেও দেখতে চাইলেন সহানুভূতি সহকারে। র‍্যাটরে বেশ বিচক্ষণের মত ব্যবহার করলেন। অবস্থাটা তিনি সামলে নিতে পারতেন। কিন্তু তাঁর আসতে ৫ ঘণ্টা দেরী হয়ে

গেছে। রেটিংরা তাঁকে চীৎকার করে স্তব্ধ করে দিল। 'Quit India' শ্লোগান বাতাসে অনুরণিত হতে থাকলো। 'তলোয়ার' ছেড়ে তিনি চলে গেলেন। র‍্যাটরে হয়তো ভাল করতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব রেটিংদের কাছে ছিল অর্থহীন। সারস রাজার স্থলে চাতক রাজাকে গ্রহণ করার মত তাদের মনের অবস্থা ছিল না। ইনিগো-জোনস্ (Inigo-Jones) অথবা কিং—উভয়েই এক। নামের আর কোন মূল্য ছিল না। তাছাড়া, ১৯৪৪ সালে বম্বেতে এম.আর. ব্যারাকস-এ খারাপ খাদ্যের অভিযোগকে নিষ্ঠুর-ভাবে চালনা করায় ইনিগো জোনস্ তো কম কুখ্যাতি অর্জন করেনি!

দিন গড়িয়ে চললো। দুপুর তিনটায় কিং আমাকে ডেকে পাঠালো। সেদিন আরো আগেই আমাকে আর. আই-এন থেকে ছাড়িয়ে দেবার কথা ছিল। কিন্তু গোটা শাসনযন্ত্রই তখন হয়ে বসেছিল বিকল। আমার প্রথম চিন্তা হলো: 'আহা, আবার জেলে ফিরে যেতে হবে।' এবার আমি আমার টুথ্ব্রাস্ এবং কিছু সিগারেট না নিয়ে আটক হতে চাইলাম না। আমার নিকটবর্তী রেটিং-এর কাছ থেকে নিলাম কিছু সিগারেট। আমার টুথ্ব্রাস্টি পকেটে পুরে নিয়ে হাজির হলাম 'সি-ও'র অফিসে। কিং সোজাসুজি কাজের কথায় এলেন: "আমি ধরে নিতে পারি, কি ঝঞ্ঝাটে পড়েছ—তা তুমি জান। এতে তোমার

'তলোয়ারে' গুলি বর্ষণের সংবাদে উত্তেজিত ক্যাসেল ব্যারাকের রেটিংরা সাথীদের উদ্ধারে বেরিয়ে পড়েছে। (পৃঃ ৩৭)

জীবন ধ্বংস হয়ে যেতে পারতো। তোমাকে রক্ষা করেছি আমি। এখন আমার এই খোলা প্রস্তাব। তুমি আমাকে রেহাই দাও, আর আমিও দেখবো যাতে তুমি বেশ ভাল-ভাবেই পুরস্কৃত হও।" আমি আশ্চর্য্য হলাম। আমার কাছে এরকম খোলা প্রস্তাবের জন্য নয়, আশ্চর্য্য হলাম এই দেখে যে রেটিংদের মনের অবস্থার ব্যাপার সে কিছুই বুঝতে পারিনি। তার কোন মূল্যবোধ ছিলনা। তাকে দেখতে আর তত ভীতিপ্রদ মনে হ'ল না।

ইতিমধ্যে রেটিংরা দল বেঁধে কিং-এর অফিস ঘেরাও করে ফেলেছে। গুজব ছড়িয়ে গেছে, কিং আবার আমাকে গ্রেপ্তার করেছে। ক্রুদ্ধ রেটিংদের দেখে সে বিচলিত হয়ে পড়ল। আমাকে অফিস থেকে বাইরে পাঠিয়ে দিল ওদের ঠাণ্ডা করার জন্য। আমাকে বললো, "দেখো, ওরা আমাকে দিয়ে কি করাতে চায়।" আমি যখন তাদের দাবী কাগজে লিখে নিয়ে ফিরে এলাম, ততক্ষণে সে 'তলোয়ার' থেকে চলে গেছে। সেবারই তাকে শেষবারের মত 'তলোয়ারে' দেখা গিয়েছিল।

১৮ই ফেব্রুয়ারীতে সাড়ে ৪টা নাগাদ 'তলোয়ারে'র ওপরে কর্তৃপক্ষের অস্তিত্বের সমস্ত চিহ্নই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ছত্রভঙ্গ সৈন্যদলের মত, কতিপয় ভারতীয় অফিসরকে দেখা গেল এদিক সেদিক চলতে ফিরতে। তাদের অবস্থা এমন হয়েছিল যে তাদের দেখলে কারো মনেই ঈর্ষার উদ্রেক

হবে না। যে ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছিল, তার ফলাফলের বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিলনা। সৈন্য-বিভাগের মধ্যে জাতীয় আন্দোলন সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আমরা যুদ্ধ করছিলাম। সফলতা আসুক বা ব্যর্থতাই আসুক আমাদের চেষ্টা কিছুটা ফলবতী হ'তে বাধ্য। ভারতীয় অফিসাররা কাজ করছিল কেন? পদমর্যাদা এবং সামান্য একটু সুযোগ সুবিধাই ছিল তাদের অধিকাংশের কাছে খুব বেশী আকাঙ্খার বস্তু। তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো স্বাধীনতার সমর্থক ছিল। কিন্তু বৃটিশদের সঙ্গে প্রকাশ্যে বিবাদ করতে গেলে যে অনেক বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে হয়! তাদের মধ্যে একজন যুক্তি দেখিয়ে আমাকে বলেছিল, জাতীয়তাবাদী নেতারা আর জাতীয়তাবাদী সংবাদ সংস্থাইতো স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। "এই ব্যাপারটা তারাই আমাদের চেয়ে ভাল জানে। আমরা কেন রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়বো?" সে মনে মনে ঠিক করেছিল যে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই যেন Dabbling in politics—রাজনীতি নিয়ে খেলা করার মত। বিমূঢ় কর্তৃপক্ষ ভারতীয় অফিসারদের কোন নির্দ্দেশই দিতে পারেনি। তাদের ভাগ্য তাদের ওপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

নূতন পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষেও আর আনন্দে পাল তুলে চলা সহজ ছিলনা। হঠাৎ নিয়মানুবর্তিতা অন্তর্হিত হবার ফলে পাওয়া গেল যে স্বাধীনতা—সে এক সম্পূর্ণ অননুভূতপূর্ব

অভিজ্ঞতা। রেটিংদের অধিকাংশের বয়স ছাব্বিশের তলায়; তাদের ছিলনা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, ছিলনা সংগঠনের ক্ষমতা। বিনা বাক্যব্যয়ে কর্তৃপক্ষকে মেনে চলাই ছিল তাদের এতদিনের একমাত্র গুণ। হঠাৎ সেখানে হুকুম করার আর কেউ রইলোনা। তারা যেন কতকটা স্তম্ভিত হলো, নিজেদের স্পর্ধা দেখে নিজেরাই অবাক; সব কিছুই বিশৃঙ্খল। কিন্তু বিশৃঙ্খলারও আছে নিজস্ব যুক্তি। যুক্তি সূত্র-গুলোকে বেছে গুছিয়ে নেওয়ার কঠিন কাজ গ্রহণ করা হলো। ব্যাখ্যা করে যুক্তি দেখিয়ে—এমনকি ভয় দেখিয়ে—আমরা বোঝাতে লাগলাম রেটিংদের। আমরা হ'তে পারি স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রথম সারির সৈনিক। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে যদি আমরা কাজ করতে চাই, তবে আমাদের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করে চলতে হবে—নিতে হবে আমাদের নিজেদেরকেই নেতৃত্বভার।

আরব সাগরে সূর্য তখন অস্তমিত। একটি স্থূল ধরণের নির্বাচন হলো। গঠন করা হলো ধর্মঘট কমিটি। আমাদের দাবী: উন্নত ধরণের চাকুরীর ব্যবস্থা আর উন্নত ধরণের খাদ্য। তার সঙ্গে ছিল, আনুষ্ঠানিকভাবে তৈরী করা রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্যের ফিরিস্তিসহ আরো একপ্রস্থ দাবী: আই-এন-এর লোকদের সমেত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি; ইন্দোনেশিয়া থেকে সকল ভারতীয় সৈন্য সরিয়ে আনা, কিংকে শাস্তি দেওয়া; "ভারত ছাড়ো"

ইত্যাদি। দেশবাসীকে সেই গুরুত্বপূর্ণ খবর জানাবার জন্য সন্ধ্যা ৭টায় প্রস্তুত হ'লাম আমরা।

এ খবর যখন বম্বে প্রেসের কাছে পৌঁছে দেওয়া হল, বলতে গেলে, তখন তারাও হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। (প্রেসে সাধারণতঃ সরকার প্রকাশিত সংবাদই প্রচার পেয়ে থাকে।) দৃঢ় জাতীয়তাবাদী মতের ঐতিহ্যবহনকারী 'ফ্রিপ্রেস্ জার্নেল্' নামের দৈনিক সংবাদ পত্রের সম্পাদক একমাত্র এস, নটরাজন, এই চাঞ্চল্যকর সংবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। সাহসে ভর করে তিনি রেটিংদের আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর সংবাদ পত্রের কলামের সদ্ব্যবহার করতে। ফেব্রুয়ারীর ১৮ তারিখে, বাকী সমস্ত জাতীয়তা-বাদী সংবাদ সংস্থার মধ্যে—কেউবা আমাদের করলেন অবিশ্বাস, কেউবা সরকারের বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি নিতে সাহস করলেন না। ফ্রি-প্রেস-জার্নেল্ হয়ে উঠলো আমাদের প্রচারের মাধ্যম। পরবর্তীকালে বিদ্রোহের খবরের জন্য তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখা হয়েছিল সেই সংবাদ পত্রের সমস্ত খবর।

১৮ই ফেব্রুয়ারী: 'তলোয়ার' অবাধ্য, উদ্ধত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—কিন্তু একা, একান্ত অসহায়। কাজে লাগার মত একটি রাইফেল্‌ও জোগাড় করা গেল না। আশু কোন ব্যবস্থা না হ'লে, স্বাধীনতার যুদ্ধে 'স্তম্ভ' ব'লে গণ্য হওয়ার কথা দূরে থাক, নিজেদের ভবিষ্যতের 'ঠেকা'

দেবার মত কোন অবলম্বনও আর রইবে না আমাদের। যেভাবেই হোক, নিকটবর্তী তীরের সংস্থা 'ক্যাসেল ব্যরাক' এর নাবিকদের কাছ থেকে সমর্থন লাভ করতেই হবে।

১৯শে ফেব্রুয়ারীর সকালবেলা 'ক্যাসেল ব্যারাকে'র লোকেরা যখন করছিল স্বাভাবিক কাজকর্ম, তখন কয়েকটি রেটিং পাহারারত প্রহরীদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, প্রধান ফটকের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এসে উঠ্‌লো 'ব্যারাক ক্যাসেলে'। 'তলোয়ার' থেকে এসেছিল তারা। অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় তাদের দেখে অন্য সবাই জড়ো হলো তাদের চারপাশে। তারা সঙ্গে এনেছিল এক ভয়ঙ্কর খবর ঃ তোমাদের ভাইদের 'তলোয়ারে'র ওপরে গুলি ক'রে—বেয়নেটের খোঁচায় মেরে ফেলছে বৃটিশ টমিরা—এই অস্বস্তিকর খবর ইতিপূর্বেই পৌঁছেছে ক্যাসেল ব্যারাকে। এবং সেখানকার লোকেরা মনে করেছিল, প্রথম সুযোগেই তারা সংবাদের সত্যমিথ্যা যাচাই করে নেবে। শুনলো এক সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সংবাদ! সংবাদে জ্বলে উঠলো তারা। তাদের বলা হল ঃ "তোমরা তোমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলো খুইয়েছো তোমাদের বিদেশী প্রভুদের হয়ে যুদ্ধ করে। এখন তোমাদের ভাইদের রক্ত দিয়ে দেওয়া হ'ল তার পুরস্কার। চ'লে এসো, আর বোকার দলের মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকোনা। লেগে পড়ো—দেশ মুক্ত

করার কাজে, স্বাধীনতা আনার কাজে।” সংবাদ বাহকরা ছুটে বেরিয়ে গেল—পাগলের মত ছুটে গেল রেটিংরা তাদের পিছনে।

যা-কিছু বিদেশীয় তাই করলো তাদের মনে ক্রোধের উদ্রেক। সহরের প্রধান সড়ক দিয়ে যেতে যেতে যখনই তারা দেখলো বিদেশীয়দের, তুড়ে তাড়া করলো তাদের—পাথর ছুঁড়তে লাগলো বিদেশী মালিকের দোকান গুলোতে। টেনে নামিয়ে ফেললো ইউ. এস. আই. এস লাইব্রেরীর পতাকা। চীৎকার করতে লাগলো ইনক্লাব জিন্দাবাদ। ‘তলোয়ারে’ পৌঁছে তারা বুঝতে পারল, তাদের হাতে আর পাশার দান নেই। ফিরে যাওয়া আর চলবে না। বৃটিশ মালিকানার সমস্ত সান্ধ্য সংবাদপত্রে, প্রান্ত থেকে-প্রান্ত জুড়ে বড় বড় হরফে, আর্তনাদ প্রকাশিত হলো নৌ-সৈনিকরা খুনের নেশায় মেতেছে। এপর্যন্ত ‘তলোয়ারে’র রেটিংদের কার্যকলাপ দাবিয়ে রাখবার জন্য কোন চেষ্টা হয়নি কোন দিক থেকেই। কোথাও একটিও বৃটিশ সৈন্যকে দেখা গেলনা ‘তলোয়ারের’ আশে পাশে।

অস্তমিত হ’লো ১৯শে ফেব্রুয়ারীর সূর্য। ‘তলোয়ার’ আর একা নয়। বম্বের তীরবর্তী ১১টি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০,০০০ রেটিং মিলিত হয়েছে, পোতাশ্রয়ের সব জাহাজ থেকে নামিয়ে ফেলা হয়েছে ‘ইউনিয়ন্ জ্যাক’। ৪৮ ঘণ্টা বাদে পরের দিন সকালে, ভারতীয় নৌসৈন্যের সকল সংস্থা

থেকেই ব্রিটিশরা তাদের প্রভুত্ব হারিয়ে ফেলল। ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়লো ৭৪টি জাহাজে—চারটি মেজর বেস্‌সহ চারটি ফ্লোটিলা এবং কুড়িটি তীরবর্তী প্রতিষ্ঠানে। এটাই সম্পূর্ণ সমষ্টি সংখ্যা।

ধর্মঘটের তীব্র গতিবেগ সবার মনে বিস্ময় জাগাল। পরবর্তীকালে অনেকেই এক কাল্পনিক ভূমিকা প্রচার করে চেষ্টা করেছে তাদের রাজনৈতিক জীবনের মূলধন তৈরী করতে, যদিও এই ধর্মঘটের সঙ্গে তাদের কোনই সংশ্রব ছিলনা। বাস্তব তথ্য হ'ল, আমাদের দলের মধ্যে কোন রাজ-নৈতিক দলেরই একটিও সক্রিয় সভ্য ছিলনা। আর-আই-এন থেকে অন্য কোথাও বিস্তৃত ছিলনা কোন গুপ্ত জাল, যে কথা অনেকেই পরে চেষ্টা করেছেন প্রচার করতে। আমাদের 'আজাদ হিন্দ' আন্দোলন ছিল সীমাবদ্ধ 'তলোয়ারের' মধ্যেই। একান্ত আলগাভাবে অন্য কয়েকটি জাহাজের সঙ্গে ছিল সংযোগ। যদি কোন জালের মত বস্তু বিস্তৃত হয়ে থেকে থাকে, সেটা হল—অসন্তোষ। অসন্তোষের চাপা আগুন ধিকধিক করে জ্বলছিল সব জাহাজে, ব্যারাকে। বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার দরুণ অফিসাররা সেটা অনুভব করতে পারেনি, চেষ্টা করেনি তাকে লক্ষ্য করতে। নৌবিভাগের বাক্যবিশারদ বলে উঠলো—"বাই গাড, এতো বিদ্রোহ"!

বলতে গেলে, সবগুলো জাহাজের এবং প্রতিষ্ঠানের বিদ্রোহ ছিল একই ধরণের।

তলোয়ারের' যোগাযোগ (সংবাদ আদান প্রদানকারী) বিভাগের রেটিংরা ছিল নৌবিভাগের চক্ষু-কর্ণ। তাদের এবং ক্যাসেল্ ব্যারাকের নাবিকদের ধর্মঘট, তাদের ওপরে চাপ সৃষ্টি করেছিল যারা তখনো ছিল ইতস্ততঃ অবস্থায়। কর্তৃ-পক্ষের বেলায়, তাদের নির্দেশ দেওয়া মত পূর্বের কোনো নজির ছিলনা। 'তলোয়ারে' কিং যেমন করেছিল, সমস্ত কমাণ্ডিং অফিসারই সেই রকম কাজই করতে লাগলো। হয় তারা নিজেরাই রেটিংদের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করলো, অথবা ঠাণ্ডা করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় সহকারীদের পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা সরে গেলো কর্মস্থল ত্যাগ করে। পুরাতন উচ্চপদস্থ রেটিংরা, প্রধান গেট অফিসার এবং গেট অফিসাররাই পার-তেন রেটিংদের নিবৃত্ত করতে । পারতেন ঠেকাতে ধর্মঘটের অঘটনকে। কিন্তু তারা নিরপেক্ষর ভূমিকা গ্রহণ করলো। তাদের অনেকেরই কম-বেশী সহানুভূতি ছিল রেটিংদের সংগ্রামে। সামান্য কয়েকজন মাত্র প্রকাশ্য ভাবেই আমাদের সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন।•

বিদেশী অফিসারদের শান্তিতেই চলে যেতে হুকুম দেওয়া হলো। ভারতীয় অফিসারদের সুযোগ দেওয়া হ'লো দল বেছে নেবার। বম্বের এক উচু বংশের লেফটেনাণ্ট সোরাণী ছাড়া আর সব ভারতীয় অফিসাররা তাদের বিদেশীয় সহকর্মী-দের অনুসরণ করাই পছন্দ করলো। 'তলোয়ারে' বসে গুপ্তকার্যকলাপে রত থাকার সময়ে কয়েকটি ভারতীয়

অফিসার গোপনে সাহায্য করতো—তারাও মনে করলো, আমরা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছি। মুহূর্তের তরেও আমরা তাদের অভাব অনুভব করিনি। কারণ, গোড়া থেকেই আমরা কেউই তাদের ওপরে ভরসা রাখিনি।

১৯শে ফেব্রুয়ারীর সন্ধ্যা নাগাদ গঠন করা হলো কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটি। তার কাজ হলো 'তলোয়ারের' বাইরে যে সব সংস্থা ছিল তাদের সমন্বয় সাধন করা, কাজ করার নির্দেশ দেওয়া। সংস্থাগুলি যেমন যেমন তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে লাগলো, তেমন তেমন তাদেরকে সমিতিতে গ্রহণ করে নেওয়া হলো। প্রথমদিন বারোজন নিয়ে আরম্ভ করে শেষদিনে সমিতির সভ্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ছত্রিশজনে। সর্বসম্মতিক্রমে অন্যতম প্রধান সিগনেল্‌ম্যান উত্তর পাঞ্জাবের পীতাভ মুসলীম এম্ এস খান্‌কে সভাপতি এবং ছোট অফিসার, রোগা লম্বা শিখ টেলিগ্রাফিস্ট মদন সিংকে সহসভাপতি নির্বাচিত করাহলো। উভয়েরই বয়স ছাব্বিশ বছরের নীচে। রাজনীতিতে উভয়েই ছিল অনভিজ্ঞ। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সোজা এসে যোগ দিয়েছিল আর-আই-এন-এর কাজে। তারা ইংরেজী, হিন্দী, এবং পাঞ্জাবী ভাষায় অনর্গল বলে যেতে পারতো। তারা উভয়েই ছিল 'তলোয়ারে'র কর্মী। যে সাম্প্রদায়িকতার সংক্রামক বিষে তখনকার ভারতের জনজীবন হয়েছিল কলুষিত, তারা ছিল সেই সংক্রামক বিষ থেকে মুক্ত। আমিও কেন্দ্রীয় নৌ ধর্মঘট কমিটিতে ছিলাম।

'তলোয়ার'-এই কমিটির অধিবেশন বসত। বিভিন্ন যুদ্ধ জাহাজগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বেতারযন্ত্রকে লাগালাম আমাদের কাজে। এক বিশেষ সংকেত প্রণালী উদ্ভাবন করা হল। আর-আই-এন এর নতুন নামকরণ করা হল ভারতীয় জাতীয় নৌবহর—Indian National Navy. কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটি এক প্রস্তাব গ্রহণ করে ঘোষণা করলো, "এখন থেকে কেবলমাত্র জাতীয় নেতাদের কাছ থেকেই নির্দেশ নিতে হবে আর-আই এন-এর রেটিংদের।"

আমাদের দ্বারা নৌবহর দখল করার খবরটি সমগ্র দেশবাসীকেই জানাবার প্রয়োজন ছিল। ফ্রি প্রেস জার্নাল সংবাদটি প্রকাশ করে দেওয়ায় অন্যান্য সংবাদ সংস্থাগুলি এবং অল ইণ্ডিয়া রেডিও বাধ্য হলো ঘটনাকে তাদের সংবাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে। আমাদের উদ্দেশ্য ভালভাবেই প্রচার লাভ করলো তবুও জাতীয় নেতাদের মধ্যে কোন একজনকেও দেখা গেলনা আমাদের জন্য অভিনন্দন পাঠাতে বা আমাদের নির্দেশ দেবার জন্য কোনরকম উদ্যম প্রকাশ করতে। আমি অস্বোয়াস্তি বোধ করলাম। কয়েক মাসের মধ্যে সেদিন প্রথম আমার দেখা দিল বিহ্বলতা, সংশয়। আমরা কি তবে ভুল করলাম! নেতারা নীরব কেন? আমাদের কাছ থেকে তাঁরা কী আশা করেছিলেন? তাঁদের কাছে গিয়ে শুধু শ্রদ্ধা নিবেদন! আমরা শুধু তাঁদের কাছ থেকেই নির্দেশ গ্রহণ করবো—একথা প্রচার করার

পরে আমরা আর বেশী কী বলতে পারতাম? কিন্তু সে সময়টা আমার মনের সংশয় প্রকাশ করার মত উপযুক্ত ছিলনা।

কমিটি স্থির করলো, কংগ্রেসের বাম ভাগের নেতা শ্রীমতী অরুণা আসফ আলির নিকটে যাবে। সে সময়ে তিনি এসে পড়েছিলেন বম্বেতে। তিনি ছিলেন এক কৃতী মুসলীম আইনবিদের হিন্দু পত্নী, ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে তাঁর জংগী ভূমিকার জন্য যিনি সকলের প্রিয়-পাত্রী হয়েছিলেন। কারো কাছে তিনি ছিলেন সেই ঐতিহাসিক কাহিনীর ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর মত, যিনি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে নিজে উপস্থিত হয়ে বৃটিশের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করেছিলেন। তিনি যে ভাবধারা প্রচার করতেন আমাদের কাজগুলিও হয়েছিল সেই রকম। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টির অভাবে বুঝতে পারিনি যে তিনি ছিলেন বৃহৎ কংগ্রেসী আন্দোলনেরই একটা অংশ মাত্র।

ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের এই সংগ্রামে আমরা অনেকেই আশা করেছিলাম তিনি এসে আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। তিনি শুধু আমাদেরউপদেশ দিলেন, শান্ত থাকো, **Remain Calm.** তাঁর কথা শোনালো মহাত্মার বাণীর প্রতি-ধ্বনির মত—অর্থহীন। নৌবিভাগ ছিল আমাদের কব্জার মধ্যে। সৈন্যবাহিনী এবং বিমান বাহিনীও আমাদের সঙ্গে

যোগ দেবে তারও অনুকূল নিদর্শন ছিল আমাদের কাছে। এমনি সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে শ্রীমতী আসফ আলি আমাদের দাবিগুলির মধ্যে আইনের ছিদ্রের ব্যাখ্যা করতে বসলেন। তাঁর মতে প্রথমত আমাদের চাকুরীর অভিযোগগুলি আমরা গুলিয়ে ফেলেছি রাজনৈতিক দাবীর সঙ্গে। সুতরাং তিনি আমাদের অনুরোধ করলেন, ঐ দুটোকে পৃথক করে ফেলো। চাকুরীর দাবীগুলো নৌবিভাগের কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করো। আমরাই তো কর্তৃপক্ষ—বলা হলো তাঁকে। তিনি বুঝতে পারলেন রেটিংরা তাদেব দাবীর খসড়া তৈরীর সুবাদে তাঁর কাছে উপদেশ চাইতে আসেনি। তিনি তাড়াতাড়ি তাদের নির্দেশ দিলেন বম্বে কংগ্রেসের সর্ব্বোচ্চ কর্তা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে পরে সংবাদপত্রে তিনি পরিষ্কার করে বলেছিলেন, ওরা (রেটিংরা) যা চেয়েছিল সেটা হচ্ছে জাতীয় রাজনৈতিক শক্তিগুলোর কাছ থেকে ওদের ন্যায্য সমর্থন লাভ করা। তাঁর হাতে আরো জরুরী কাজ থাকায় তাঁকে এর পরে শীঘ্রই বম্বে ছেড়ে চলে যেতে হয়। কিন্তু তিনি ভোলেননি বেচারী রেটিংদের। তিনি টেলিগ্রাম করেছিলেন নেহরুকে এই বলে যে, তখন বম্বেতে নেহরুর উপস্থিতি প্রয়োজন, একমাত্র তিনিই পারেন বম্বেকে রক্ষা করতে।

পরবর্তী ঘটনাগুলো থেকে বুঝতে পারলাম, জাতীয়

নেতারা আমাদের প্রচেষ্টাকে কি দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। সেই তারবার্তা তারই এক পরিচ্ছন্ন সংক্ষিপ্তসার বা চুম্বক।

যে সকল লোক আমাদের নেতৃত্বদান করবেন বলে আমরা সাগ্রহে তাকিয়ে ছিলাম, তাঁরা এই উত্থানের ব্যাপার নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তার অপব্যয় করলেন না। এমন একটা ভাব প্রকাশ করা হল, যেন আমাদের নিয়ে কি করা হবে তাই তাঁরা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তাঁদের কাছে আমরা ছিলাম অবাঞ্ছিত। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে দেবার মত আমাদের থাকতে পারেনা কিছু। সর্দার প্যাটেল আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন, যেন আমরা একদল উগ্রমস্তিষ্ক যুবক এসে জগাখিচুড়ি পাকাচ্ছি এমন সব ব্যাপারে যাতে আমাদের নাক গলাবার কথা নয়। Bunch of young hotheads messing with things they had no business in. (স্বাধীনতার কয়েক মাস আগে বম্বেতে চৌপাটি সমুদ্রতীরে এক সাধারণ সভায় এই কথা তিনি হিন্দীতে বলেছিলেন।) হিন্দু, মুসলমান অথবা শিখ নেতারা তখন কন্‌ফারেন্স টেবিলে মত্ত। তাঁদের কাছে আমরা ছিলাম শূন্যলোক থেকে আসা মূর্খ বা young fools. যারা তাঁদের কাছ নেতৃত্ব আশা করছে। রাজনীতি অরণ্যে আমরা এমনই অবোধ শিশুর মত ছিলাম যে একটা সাধারণ বাস্তব তথ্য আমাদের খেয়ালে আসেনি। আজ অবশ্য সে সত্য আমার কাছে খুব স্পষ্ট যে যেসব লোক শুধু নিয়মতান্ত্রিক

অহিংসা, অসহযোগে আস্থা স্থাপন করে বসে আছেন, তাঁরা এসে দেবেন আমাদের বিপ্লবের নেতৃত্ব—এঁদের ভরসায় আমাদের পক্ষে একটি বিপ্লব শুরু করা চলে না।

এক নেতা থেকে অন্য নেতার কাছে ধাক্কা খেয়ে ঘুরতে লাগলো খান্ এবং এন-সি-এস-সি-র কিছু সভ্য। লাভ হলো কিছু শুকনো উপদেশ। কিছু 'সুবিবেচক' রাজনীতিবিদরা খান্‌কে উপদেশ দিলেন মুসলিম লীগের সমর্থনের প্রার্থনা জানাতে। তারা ছিল রাজনীতির কারবারী—কুটবুদ্ধিতে তারা ছিল যথেষ্ট সজাগ। লীগকে যেন বাইরে না রাখা হয়। ভবিষ্যতে রেটিংদের জয় বা বিপর্যয় থেকে রাজনৈতিক মূলধন লীগ যাতে একাই না নিতে পারে।

ইতিমধ্যে এই বলে সংবাদ চলে গেলো জাহাজগুলোতে এবং তীরবর্তী প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে কমিটি আমন্ত্রণ জানিয়েছে নেতাদের 'তলোয়ারে' আসতে। শ্রীমতী আসফ আলি শীঘ্রই আসবেন বলে আশা করা হয়েছিল। প্রত্যেক জাহাজ এবং তীরবর্তী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে এসে হাজির হতে লাগলো রেটিংগণ। জাতীয় একতার ডাকের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে আন্দোলিত হতে লাগলো বম্বে সহরের রাস্তা-গুলো। ধ্বনিত হতে লাগলো—হিন্দু মুসলিম এক হো, ইন্‌কিলাব্ জিন্দাবাদ্। বম্বের পক্ষে সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য, জাতীয়তার একত্বের প্রতীক হিসাবে কংগ্রেস ও লীগের পতাকা একসঙ্গে বেঁধে নিয়ে বহন করে চলেছিল রেটিংগণ,

বীরপদক্ষেপে বম্বে সহরের রাস্তার ওপর দিয়ে। দেওয়া হতে লাগলো উল্লাসধ্বনিতে উৎসাহদান। রেটিংগণ বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল দুইদলের পতাকা। কারণ, তাদের কাছে মনে হয়েছিল ১৯৪৬-এ কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যকার মতভেদই আটকে রেখেছিল ভারতের স্বাধীনতা। অনেকের কাছেই মনে হয়েছিল কংগ্রেস-লীগের মধ্যে কলহের সুযোগ নিচ্ছিল বৃটিশ। আমরা মনে করলাম, আমাদের সাধারণ শত্রু বৃটিশের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবাসীর একতাবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো প্রয়োজন। নৌবিভাগ ভারতের সবার প্রয়োজনে দখল করা হয়েছে। হিন্দু এবং মুসলমান রেটিংগণ যথাক্রমে কংগ্রেস ও লীগের অনুগামী—পরে কোন কোন লোক এই বর্ণনা দিয়ে দুই মিলিত পতাকার তাৎপর্য ব্যাখা করেছিল। যখন এই বিকৃত ভাষ্য প্রচার লাভ করছিল ততক্ষণে আমাদের নিস্তব্ধ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে আমাদের ওপরে যতপ্রকার অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে, এটা তার মধ্যে কেবল মাত্র একটি নমুনা।

'তলোয়ারে' রেটিংরা একত্রিত হলো এক মহাসভায়-চললো অপেক্ষা করা, আলোচনা করা—অপেক্ষা করা, আলোচনা করা। কোন নেতাই এলেন না রেটিংদের সাথে কথা বলতে। অবশেষে কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটির সভ্যগণ ফিরে এলো এই বার্তা নিয়ে যে রেটিংদের থাকতে হবে শান্ত হয়ে, যেতে হবে নৌবিভাগের কর্তৃপক্ষের কাছে চাকুরী সংক্রান্ত দাবী নিয়ে।

বেতন ও সুযোগ সুবিধা রক্ষা করার খাতিরে ভারতীয় অফিসাররা লজ্জায় সরে পড়লেন আমাদের কাছ থেকে। জাতীয় নেতারাও করলেন আমাদের পরিত্যাগ। বড়দরের কোন নেতাই এলেন না বম্বেতে। মহাত্মা গান্ধী তখন ছিলেন তাঁর মধ্যভারতের আশ্রমে। গোলমালের কথা জেনে তিনি একদিন সান্ধ্য প্রার্থনা সভায় প্রসঙ্গক্রমে বললেন, রেটিংরা যদি অসন্তুষ্টই ছিল তবে তারা তো কাজে ইস্তফা দিতে পারতো!—could have resigned. মহাত্মাজী ছিলেন বলপ্রয়োগে বিরত থাকার নীতিতে অবিচল।

বছরের পর বছর ধরে তিনি চেষ্টা করে চলেছিলেন তাঁর অনুগামীদের তাঁর নিজের পথের কার্যকারিতা সম্বন্ধে শিক্ষা দান করতে। যারা তাঁর অনুগামী হয়ে চলতে গররাজী ছিল তারা অন্তত যাতে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, সে দিকে তাঁর খেয়াল ও লক্ষ্য ছিল। তাঁর এইটুকু লক্ষ্য ছিল যে নৌ-বিদ্রোহ যেন জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে না যায়। কারণ এতে হিংসার গন্ধ আছে। পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য বিষয়টি ছেড়ে দিলেন তাঁর যোগ্য অনুচর সর্দার প্যাটেলের ওপর। আর. আই. এন.এর সবগুলো পতাকা দণ্ড থেকেই দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের পতাকা এক সাথে উড়ছিল। পরিস্থিতির এই ঘোলাটে ঐতিহাসিক পরিহাসটুকু বম্বের সাধারণ লোকদের দৃষ্টি এড়ায়নি।

ফেব্রুয়ারীর বিশ তারিখে স্বাধীনতার মদিরার রং মনে

হলো যেন একটু ফিকে, আবেগের উচ্ছলতা কিছুটা মন্দীভূত। এখন এন. সি. এস. সি. বুঝেছেন, যে জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের কাছে তাঁদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ালো সহজ সরল। হয় এগিয়ে যেতে হবে একাই, নয়তো কিছু দর-কষাকষি করতে হবে চাকুরীর ব্যাপারে—আরো কিছু ছোট খাটো সুবিধার ব্যবস্থা করে নিতে। ফলে দেখা দিল দ্বিধা, বিহ্বলতা ও বিচলিত হওয়ার লক্ষণ। এর পরে কোন পথ নিতে হবে সে বিষয়ে অনেকেরই কোন ধারণা না থাকায় কাজের বদলে বাকবিতণ্ডা এসে আসর দখল করলো। তথাপি আমরা সরাসরি ভাবে সমস্যার সম্মুখীন হলাম না। কারো কারো মন আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠলো sense of discipline বা নিয়মানুবর্তিতাবোধে। আগের দিন 'তলোয়ারে' যাবার সময় যে গুণ্ডামী ঘটেছিল তার নিন্দে করা হলো। ইউ. এস. আই. এস. লাইব্রেরী থেকে পতাকা নামিয়ে ফেলে যে উচ্ছ্বাস দেখান হয়েছিল তার জন্য নিয়মমাফিক দুঃখ প্রকাশ করা হলো, নিরর্থক তর্ক-বিতর্কে নষ্ট হলো অনেক মূল্যবান সময়।

দুপুরবেলা ফ্ল্যাগ অফিসার কমাণ্ডিং ভাইস অ্যাডমিরাল গডফ্রে নৌবাহিনীব সর্বোচ্চ অফিসার (FOCRIN) এসে পৌঁছলো বম্বেতে। শুধু ক্ষণিকের বিহ্বল ভাবকে সামলে নিচ্ছিল কর্তৃপক্ষ। আমাদের জাহাজের জোরালো বিতর্ক

নিস্তেজ হয়ে পড়ল। কেন্দ্রীয় সমিতির অনেক সভ্যই উদগ্রীব হয়ে উঠলেন গডফ্রের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। খানের অধীনে একটি আলোচনা সমিতি FOCRIN গডফ্রে-এর সঙ্গে দেখা করতে গেল। আমাদের প্রথম ভুল হয়েছিল জাতীয় নেতাদের উপর আস্থা স্থাপন করে থাকা। FOCRIN (গডফ্রে) এসে রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলে, আমরা আমাদের দ্বিতীয় ভুলটি করে বসলাম। সংগ্রামীঅংশ নিঃসহায়ভাবে দেখতে লাগলো, আশায় বুক বেঁধে খান এগিয়ে চলেছেন আলোচনার টেবিলের দিকে এই আলোচনায় যাওয়াটাই নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। কারণ ভারতের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞরা বছরের পর বছর ধরে ব্যর্থভাবে এই কাজেই মস্তিষ্ক চালনা করেছেন। খুব সামান্য লোকই এটা বুঝতে পেরেছিল যে যখনই আলোচনা সমিতি টেবিলে FOCRIN (গড্ফ্রের) মুখোমুখি হয়েছে তখনই আন্দোলনের জোয়ারে ভাঁটা পড়েছে।

সমিতি FOCRIN (গডফ্রে) এর কাছ থেকে এই অনুরোধ নিয়ে ফিরে এলো যে বৈকাল সাড়ে তিনটার মধ্যে সমস্ত রেটিংদের ফিরে যেতে হবে নিজ নিজ জাহাজে, এসটাব্লিসমেণ্টে। এই অনুরোধের জন্য রেটিংদের অধিকাংশই প্রস্তুত ছিলনা। আবার আলোচনার বৈঠক বসলো। আমরা যুক্তি দেখালাম যে যেখানে আক্রমণ করা দরকার সেখানে আলোচনাসমিতি বলছে আমাদের পেছিয়ে যেতে।

কিন্তু অনেকেই অনিচ্ছুক ছিল নির্বাচিত নেতাদের অনুরোধ অমান্য করতে।

তাদের নিয়মানুবর্তিতা বোধ ছিল প্রখর। অনেকে চলে গেল তাদের জাহাজের ব্যারাকে। বিকাল সাড়ে তিনটায় মিলিটারী পুলিশের গাড়ী এসে তুলে নিতে লাগলো, যে রেটিংকে রাস্তায় পেলো তাকেই। তাদের গ্রেপ্তার করা হলোনা কিন্তু ফিরে পাঠিয়ে দিলো তলোয়ারে। শুরু হয়ে গেল ওদের আক্রমণ। কর্তৃপক্ষ কিন্তু সাবধানে অগ্রসর হতে লাগলো। সন্ধ্যাবেলা প্রত্যেকটি গেটে সশস্ত্র প্রহরী দেখা গেল। সন্ধ্যাবেলার সে ছবিটা আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে। বুঝতে পারলাম, আর আমাদের শেষ হতে বিশেষ বাকী নেই।

একটানা সভা চলেছিল কেন্দ্রীয় সমিতির। পরিষ্কার বোঝা গেল, সশস্ত্র প্রহরীদের দেখে রেটিংগণ বিচলিত হয়ে পড়েছে। রেটিংদের মনোভাব বুঝতে পেরে কমিটি স্থির করলো আবার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করবে। খবর পাঠান হলো জাহাজগুলিতে "আমরা আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে চাপ সৃষ্টি করবো যাতে কর্তৃপক্ষ সরিয়ে নেয় সমস্ত সশস্ত্র প্রহরী। আমাদের কমরেডদের নিকট একান্ত ভাবে আবেদন জানান হচ্ছে, তাঁরা যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁরা যেন সম্পুর্ণ শান্তভাবে ও একতা রক্ষা করে চলেন, কোন প্রকার প্ররোচনা বা চাপে পড়ে হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়ে না পড়েন। আমরা সকল কমরেডদের কাছে আবেদন

রাখছি, তাঁরা যেন অহিংসভাবে অবস্থান করেন”। কোন ভিন্ন কাজের ধারা গ্রহণ করার মত মনের জোর কমিটি হারিয়ে ফেলেছিল। জাতীয় নেতারা রেটিংদের জানিয়ে দিয়েছেন, রেটিংরা যেন রাজনৈতিক দাবীগুলো উত্থাপন না করে। তাঁরা রেটিংদের আরো উপদেশ দিলেন যে রেটিংরা যেন বেশ শান্ত থেকেই কথাবার্তা চালায় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। বৃথাই আমরা গর্জাতে লাগলাম। আমরা বোঝাতে চেষ্টা করলাম অহিংস পন্থা আমাদের পক্ষে দুবোধ্য। আমরা শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছি যোদ্ধা হিসাবে। আমাদের পক্ষে বন্দুক উঁচিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ আর নাও আসতে পারে। কিন্তু আমাদের পক্ষে কেবল কথা বলা ছাড়া, আর কিছুই করা সম্ভব হলনা।

কমিটি র‍্যাটরে-এর বাংলোতে গিয়ে FOCRIN (গডফ্রে এর সঙ্গে দেখা করলো। FOCRIN (গডফ্রে) একটা কূট-বুদ্ধির চাল চাললেন। তাঁর জানা ছিল, মেসের কামরা থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে অনেক রেটিংই প্রকৃতপক্ষে উপোস করে রয়েছে। তিনি ধরে নিলেন, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে উপবাস ভাঙতে রাজী করান যাবে। সংবাদপত্র এবং বেতার যন্ত্রের সাহায্যে খাদ্যের প্রশ্নকে বেশ ভালভাবেই প্রচার করা হয়েছিল। সেই মুহূর্তেই খাদ্যের দাবী সম্বন্ধে সব অভিযোগ মিটিয়ে দিতে তিনি রাজী হয়ে পড়লেন। কিন্তু জানালেন, অন্য কোন

দাবী নিয়ে আলোচনায় বসতে তিনি প্রস্তুত নন। তাঁর যুক্তির ভিত, শক্ত, নিরেট। আর যাই হোক, রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা চালাবার বিষয় ছিল তাঁর এক্তিয়ারের বাইরে আর সে বিষয় নিয়ে রেটিংদেরও আলোচনা করার কথা নয়। অ্যাডমিরাল তো আগেই জানতে পেরেছেন রাজনৈতিক নেতাদের মনোভাব। তিনি ধরে নিয়েছেন যে, একবার ভাল খাদ্যের দাবী মেনে নিলে নেতাদের সহানুভূতি এসে যাবে তাঁরই অনুকূলে। তাছাড়া চাকরির বিষয়ে দাবীগুলো বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হলো। তাঁর যুক্তির সারবত্তা প্রচারের জন্য তাঁর হাতে ছিল প্রচার যন্ত্র। তিনি শুধু কালহরণের কৌশল নিলেন, একটু ঝুঁকিও নিয়ে বসলেন; অস্বীকার করলেন, সশস্ত্র পাহারা উঠিয়ে নিতে। আলোচনা পরিষদ ফিরে এলো 'তলোয়ারে' কেন্দ্রীয় সমিতির সঙ্গে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে।

আমরা দেখতে পেয়ে খুসী হলাম এন.সি.এস.সি-তে এমন একটিও লোক ছিলনা যার FOCRIN (গডফ্রের) এর চাতুর্য সম্বন্ধে সন্দেহ ছিলনা। এখনো তাঁর এমন অবস্থা ছিলনা যে আমাদের উপর আক্রমণ শুরু করতে পারেন। কাজেই চলছিল নিপুণ কৌশলের খেলা। আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছিল। জাতীয় নেতাদের সহানুভূতির ওপরেও তিনি বেশ ভরসা করেছিলেন।

আমাদেরও হতাশা বোধ করার কোন কারণ ছিলনা। সমস্ত জাহাজের কামানগুলো ছিল আমাদের এক্তিয়ারে—বেশ আশাপ্রদ সংবাদ আসছিল ভারতীয় বিমান এবং সৈন্য বিভাগের লোকদের কাছ থেকে। তারা ছটফট করছিল ব্যারাক ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে যদি আমরা গুলী চালাতে শুরু করি। অবশেষে এন.সি.এস.সি ভাল খাদ্যের আশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করার সঙ্কল্প নিলেন। কিন্তু তখনো তাঁরা আস্থা রেখেছিলেন অহিংসাবাদে। স্থির করলেন জাতীয় নেতাদের ইচ্ছাকে অনুসরণ করেই চলতে হবে রেটিংদের। অনশন ধর্মঘটই তাঁদের কাছে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র বলে মনে হলো। তাঁরা ভেবে দেখেননি রেটিংদের শিক্ষা ছিলনা এভাবে অহিংস সংগ্রাম করার এবং এই কৌশলের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব থেকেও তারা বঞ্চিত। এভাবে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম তৃতীয় ভুলের ফাঁদে। সর্বত্র রেটিংদের মধ্যে নির্দেশ পাঠানো হলো যদি ভোর অবধি পাহারা উঠিয়ে না নেওয়া হয় তবে আগামী কাল সকাল সাড়ে সাতটা থেকে অনশন ধর্মঘট স্থুরু করতে হবে—কাজে, কথায়, কিছুতেই প্রকাশ পাবে না হিংসার কোন ছায়া।

সশস্ত্র প্রহরার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অনশনের এই ডাক। তাদের উপস্থিতি আমাদের ব্যর্থতার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। এই সশস্ত্র প্রহরী ভারতীয় সৈন্যদ্বারা গঠন করা হয়েছিল। 'তলোয়ারে'র ফটকের পাহারার লোকদের দেখা গেল,

পাহারা দেবার চেয়ে গণ্ডগোলের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতেই তারা যেন বেশী আগ্রহী। রেটিংদের প্রাচীরের মধ্যে আটকে রাখবার জন্য ততবেশী আগ্রহ দেখা গেলনা তাদের। যখন সত্য ঘটনা তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হলো, তারা হয়ে উঠলো বন্ধুভাবাপন্ন। কাজেই রেটিংরা খুশীমত 'তলোয়ার' থেকে বাইরে আসতে ও ভিতরে ঢুকতে পারছিল। সেদিন সর্বত্রই চললো এই একই অবস্থা। 'তলোয়ারে'র ফটকে পাহারার লোক আসামাত্র আমরা পেছনের প্রাচীরে মই ঝুলিয়ে দিলাম তার ওপরে বেশ আড়ম্বর সহকারে চিত্রিত করে লিখলাম—'আজাদ হিন্দ গেট'।

নিঃশব্দে ২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রভাতের উদয় হল। সংবাদপত্রে খবর প্রকাশ হলো—কোন কোন বামপন্থী রাজনৈতিকদল সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। কংগ্রেস বিরোধিতা করে বিবৃতি প্রকাশ করলো। তখনো রেটিংগণ বেরিয়ে আসতে পারছিল 'তলোয়ার' ও পোতাশ্রয় ডক থেকে। 'ক্যাসাল ব্যারাক' ও ডকইয়ার্ড বরাবর বৃটিশ সৈন্যদের ঢুকিয়ে দেওয়া হল। সহরের ব্যবসা কেন্দ্রের পাশাপাশি এবং অতি নিকটে অবস্থিত এই ডক ইয়ার্ড এবং 'ক্যাসাল ব্যারাকস'। ক্যাসাল ব্যারাকস এর ঠিক সামনেই টাউন হল ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বিরাটকায় সৌধগুলি। সেদিন সকালে প্রায় ৫,০০০ রেটিং 'ক্যাসাল ব্যারাকে' ছিল। যারা জাহাজে ব্যারাকে যায়নি তারা সেখানেই কাটিয়েছিল

রাতটা। কমিটির আহ্বানে অনশন ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছিল।

সকাল প্রায় ৯টায় ভারতীয় সৈন্যগণ 'ক্যাসাল ব্যারাকের' রেটিংদের ওপর গোলা বর্ষণ করলো। প্রথম গোলার সঙ্গে ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে গেল অহিংসার সঙ্কল্প। রেটিংগণ ছুটে গেল সংগ্রামস্থলে 'Action Station'-এ। বছরের পর বছর ধরে তারা এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিল। ভারতীয় সৈন্যরা বৃটিশ অফিসারদের আজ্ঞাধীন। রেটিংরা প্রত্যুত্তরে গুলি চালিয়ে মোকাবিলা করতে চাইলোনা। তারা লাউড্ স্পিকারের সাহায্যে ভারতীয় সৈনিকদের উদ্দেশ্য করে জানালো ঃ "ভাইসকল, আমরা কেবল নিজেদের জন্যই এ যুদ্ধ করছি না—করছি দেশের স্বাধীনতার জন্য—সে যুদ্ধ তোমাদেরও।" বন্ধ হলো গুলি ছোঁড়া। এটা ঠিকই যে ভারতীয় সৈন্যদের বেশী বোঝাবার প্রয়োজন ছিল না। তাদের মনের আনুগত্য ছিল যথার্থ স্থানেই। কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা—তারপরেই একটি সৈনিক সংকেতে জানিয়ে দিল, তারা ছুঁড়ছিল ফাঁকা গুলী। 'ক্যাসাল ব্যারাকে'র অভ্যন্তর উল্লাসে ফেটে পড়লো। তার কিছু বাদেই ভারতীয় সৈন্যদের মার্চ করিয়ে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া হলো।

বেলা ১১টার সময় যখন বৃটিশসৈন্য পরবর্তী আক্রমণ সুরু করলো, তৎক্ষণে রেটিংগণ দাঁড়িয়ে গেছে যুদ্ধ করার ভঙ্গিতে। ক্যাসেল ব্যারাক তৈরী হয়ে গেছে দীর্ঘস্থায়ী

অবরোধের সম্মুখীন হতে। পাচক ও শুশ্রূষাকারী পরিচারকরা এসে দাঁড়াল কাজের জন্য তৈরী হয়ে। অহিংসাবাদের ঘটেছিল যে পরিণতি, অনশন ধর্মঘটের ও লাভ হলো সেই একই পরিণতি—রেটিংরা এখন দাঁড়ালো তাদের পরিচিত ভূমিতে। তাদের মনে আর কোনো দ্বিধা ছিল না—তাই যুদ্ধ করার প্রয়োজনে খাদ্য গ্রহণ করা স্থির হল।

আগের দিন রাতে তিনটি ভারতীয় অফিসার লুকিয়ে এসে বসেছিল সেখানে। তাদের বন্দী করা হল। পরে তাদের বার করে দেওয়া হবে। ক্যাসেল ব্যারাকের সমুদ্রের ধারের দিকে বেশ বৃহদাকার পাথরের দেওয়াল ছিল। যে গেটটা ছিল শহরের ব্যবসার মহল্লার দিকে, তাকে ভেঙ্গে ফেলতে হলে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরকের প্রয়োজন। ডকের দিক থেকে ছোট ছোট অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বৃটিশরা বেশ একটি সংঘাত সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু তারা নিকটেও ঘেঁষতে পারলো না। রেটিংরা পাহারা দিচ্ছিল ডকের ফটকে। যুদ্ধের চেহারা দেখতে গিয়ে কৃষ্ণান নামে এক অসামরিক, অনুসন্ধিৎসু, শুশ্রূষাকারী পরিচারক মারা গেল।

'তলোয়ারে' কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটির কাছে খবর এল 'ক্যাসেল ব্যারাক' আক্রান্ত হয়েছে। নিজে এসে দেখার জন্য বেরিয়ে এলেন সভাপতি খান। একবার যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে আক্রমণের কাজ বেশ ভালভাবেই সুরু হয়েছে, তখন তিনি স্থির করলেন কমিটির আস্তানাটি আরো

সুবিধাজনক জায়গায় তুলে নিয়ে যেতে হবে। স্বভাবতঃই পছন্দ করে নেওয়া হলো ফ্ল্যাগ শিপ 'নর্মদাকে'। ভারতীয় নৌ-বিভাগের সবচেয়ে আধুনিক স্লুপ 'নর্মদা'; মাত্র ১৯৪১ সালে ব্রিটেনে তৈরী। সেটাই হলো আমাদের যুদ্ধচালনার হেড কোয়ার্টারস। পোতাশ্রয়ের সমস্ত জাহাজকেই নির্দেশ দেওয়া হলো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে—"Raise steam and prepare for action stations"। তাদের বলা হলো সমগ্র বম্বে সহরের চারধারে যুদ্ধ সজ্জায় দাঁড়াতে প্রয়োজন হতে পারে। "আমাদের জাহাজ এবং আমাদের পোতাশ্রয়কে রক্ষা করতেও এর প্রয়োজন হতে পারে।" শত্রুপক্ষ সেই নির্দেশটি ধরতে পেরেছিল। পরবর্তীকালে কর্তৃস্থানীয় লোক এবং কোন কোন রাজনৈতিক নেতা এই খবরকেই রেটিংদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। তারা রেটিংদের নামে এই বলে দোষারোপ করলো যে তারা বম্বে সহরকে উড়িয়ে দেবার মতলব এঁটেছিল—to "blow up the city"।

শক্তি প্রয়োগের প্রথম দর্শনেই এন.সি.এস.সি-র কৌশল —অহিংসা ও অনশন ধর্মঘট—উবে গেলো। উস্কানী পেয়েও যদি অহিংসার পথে চলা যেতো তবে জাতীয় নেতাদের অপদস্ত করার বেশ ভাল সুযোগই পাওয়া যেতো। কিন্তু আমরা ছিলাম নেহাৎ জাহাজী লোক—কেউই সাধু সন্ত ছিলাম না। বলপ্রয়োগের জবাব দেওয়া হল বল প্রয়োগ করে। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের পথ প্রশস্তই হলো।

আমাদের পরিত্যাগ করার অনুকূলে নেতাদের হাতে সমস্ত যুক্তি যুগিয়ে দিলাম।

রেটিংরা যতক্ষণ ছিল কামানের পিছনে ততক্ষণ প্রভূত সম্পত্তি ও কিছু জীবন নষ্ট না করে তাদেরকে জব্দ করা যেতো না। তবে রসদ বন্ধ করে তাদের বশ মানান যেত। সৈন্য সমাবেশ দেখে বোঝা গেল, কর্তৃপক্ষ তারই ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে। সহরে গুজব রটে গেল বৃটিশ কর্তৃপক্ষ রেটিংদের অভুক্ত রাখার মতলব করেছে। জনসাধারণ ছুটে এলো আমাদের বিপদ থেকে মুক্ত করতে। সর্বস্তরের লোক এসে জড়ো হলো সমুদ্রতীরে, কারো হাতে খাবারের প্যাকেট কারও হাতে খাবার জল ভরা পাত্র। রেস্টোঁরার মালিকরা জনগণকে অনুরোধ করতে লাগলো যতখুশী খাবার তুলে নিয়ে অবরুদ্ধ রেটিংদের দিয়ে আসতে। রাস্তার ভিক্ষুকরা ক্ষুদে ক্ষুদে প্যাকেট নিয়ে পোতাশ্রয়ের সামনের দিকে এগিয়ে আসছে দেখতে পাওয়া গেল—সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য। সমস্ত এলাকায় সশস্ত্র ভারতীয় সৈন্যরা টহল দিয়ে ঘুরছিল। বৃটিশ সৈন্যরা তৈরী হয়ে ছিল একটু তফাতে। হাজার হাজার বম্বের নাগরিক খাবারের প্যাকেট সঙ্গে এনে সমুদ্রকূল অবরোধ করে ফেললো। কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে ভারতীয় সৈন্যরা ঐসব খাবারের প্যাকেট, জাহাজ থেকে পাঠান ছোট নৌকায় তুলে দিতে সাহায্য করছিল। বৃটিশ সৈন্যরা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দেখছিল। কয়েকঘণ্টার মধ্যে

'তলোয়ারে'র প্রাচীরের ওপর দিয়ে টপকে আসা এত খাবারের পার্শেল পেলাম যে আমাদের ১,৫০০ রেটিংদের কয়েকদিন ধরে খাবার পক্ষে যথেষ্ট।

ডক-ইয়ার্ডে অথবা 'ক্যাসেল ব্যারাকে' প্রবেশ করার জন্য বৃটিশ টমীদের সব রকম প্রচেষ্টাই প্রতিহত করা হলো। যেসব জায়গা থেকে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল, জাহাজ থেকে সে সব জায়গায় বিশেষ করে ওয়ার্লিকান কামানের গোলা ছোঁড়া হলো। বেলা আড়াইটা অবধি বিক্ষিপ্তভাবে ছোট আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলী গোলা চলছিল—মাঝে মাঝে গ্রেনেড বোমাও ছোঁড়া হচ্ছিল। সেই সময়ে FOCRIN (গডফ্রে) এর গলা শোনা গেল অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে। তিনি বললেন : "সরকারের সমস্ত সশস্ত্র শক্তি নিয়োগ করা হবে এ বিদ্রোহ দমনে—তাতে সমস্ত নৌবহর ধ্বংস করতে হলেও দ্বিধা করা হবে না……।" স্পষ্টতঃ বোঝা গেল, জাহাজের কামানগুলোকে ধ্বংস করার মত যথেষ্ট শক্তিশালী অতিরিক্ত সৈন্যদল রওয়ানা হয়েছে। এন. সি. এস. সি. এর কাছে এক বার্তা এলো যে FOCRIN (গডফ্রে) পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছুক। এই বার্তা পেয়ে গুলিছোঁড়া বন্ধ করার—"Cease fire"-এর নির্দেশ দিলেন কমিটি। এর পরে প্রেসিডেন্ট খান বার্তা পাঠালেন : "আশা করা যায় তোমার দিক থেকেও কোন আক্রমণ হবেনা। আমি FOCRIN (গডফ্রে) এর সঙ্গে দেখা করছি……।" এই

কামানের লড়াইয়ে রেটিংরা আত্মরক্ষাত্মক (defensive) ভূমিকা নিয়েছিল। এন. সি. এস. সি. থেকে তাদের প্রতি কড়া নির্দেশ ছিল "তাদের প্রতি গুলি না ছোঁড়া হলে তারা যেন গুলি না ছোঁড়ে।"

'ক্যাসেল ব্যারাকে' আর একটি সংবাদও এসে গেল যে FOCRIN (গডফ্রে) নিজে আসছেন রেটিংদের সঙ্গে আলোচনার জন্য। যদি তিনি একটা সাদা পতাকা হাতে নিয়ে বাইরে ফটকের সামনে অপেক্ষা করেন, তবে রেটিংরা তার সঙ্গে দেখা করতে সম্মত আছে। অপেক্ষা করে রইলো তারা। FOCRIN (গডফ্রে) এর আর দর্শন মিললো না। কি যে ঘটছিল, কেউ জানতে পারলো না।

কামানের কাছেই অপেক্ষা করলো তারা। অপেক্ষা করলো তারা একা, বা দলে-দলে। ততক্ষণে তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। যদি তারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতো, তবে পরিস্থিতি থাকতো তাদের আয়ত্তের মধ্যে—তারাই হতো সে পরিস্থিতির নায়ক। কিন্তু তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল অহিংসভাবে থাকার। এখন আর ঘটনা তাদের আয়ত্তাধীন নয়—অন্যান্য শক্তির হাতের পুতুল হয়ে দাঁড়ালো। তাদের মধ্যে কারোরই সাধ্য ছিলনা পরিস্থিতিকে আবার তাদের অনুকূলে পরিবর্ত্তিত করার। কর্তৃপক্ষ যখন ছিল আক্রমণমুখী, তখন তারা হয়ে পড়েছিল বলপ্রয়োগে উৎসাহী ; আবার কর্তৃপক্ষ যখন দম নেবার জন্য আক্রমণ স্থগিত রাখতে চাইলো,

তখন তারা হয়ে পড়লো অহিংসাবাদী। খবর এলো, নৌ-কর্তৃপক্ষ জাতীয় নেতাদের সাথে আলোচনা করছেন। দৃশ্যতঃ খান ও আলোচনা সমিতি কালহরণ করে যাচ্ছিল। রেটিংরা যখন অপেক্ষা করছিল তখন তাদের নেতারা কনফারেনস টেবিলে বসে নৌবিভাগের বড়কর্তার সঙ্গে তাদের লক্ষ্যের দিকে না হোক তাদের মামলার বিষয় নিয়ে লড়ে যাচ্ছিলেন।

তাছাড়া এই যুদ্ধবিরতির এলোমেলো অবস্থার সময়ে কনফারেনস টেবিলে আলোচনারত সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি বাদেও অন্য অনেক শক্তি সক্রিয় হতে থাকে। বৃটিশ পার্লামেন্টে শ্রমিকদলীয় প্রধান মন্ত্রী এট্‌লি ঘোষণা করলেন যে রয়েল নেভীর জাহাজগুলো পূর্ণগতিতে বম্বের দিকে এগিয়ে চলেছে। দিল্লীর জেনারেল হেড কোয়াটার থেকে ঘোষণা করা হলো ঃ জল ও স্থলবিভাগের শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গোলযোগের কেন্দ্রস্থল বম্বে, করাচী ও পুণা অভিমুখে রওনা হয়েছে। করাচীতে পুরাতন 'হিন্দুস্থান' জাহাজ থেকে টমীদের সাথে গুলিগোলা বিনিময় চলছিল্ল। এবং পুনাতে অবস্থিত রাজকীয় ভারতীয় বিমান বিভাগের সৈন্যগণ (Royal Indan Air Force) এবং কিছু কিছু ভারতীয় সৈন্যসংস্থা ধর্মঘট সুরু করেছিল। আর. আই. এ. এফ-এর একটি স্কোয়াড্রনকে বলা হয়েছিল বম্বের দিকে যেতে—তারা অবতরণ করে বসলো যোধপুরে—প্রত্যেক বিমানেই রহস্যময়-ভাবে দেখা দিলো ইঞ্জিনের গোলযোগ।

তখনো আমরা আশা করছিলাম, কিছু মূল্য দিয়ে জয়-লাভের সম্ভাবনা আছে। তবে নিঃসন্দেহে আমরা ক্রমেই জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে চারিদিক থেকেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছিলাম। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারলাম সৈন্য-বিভাগের অন্য দুই শাখার সম্ভাব্য সাহায্য ছাড়াও একমাত্র জাতীয় নেতারা ছাড়া জনসাধারণের সমর্থন আমাদের অনুকূলে ছিল। সহজাত বুদ্ধিতে তারা বুঝতে পেরেছে, সব কিছু ঠিকমত চলছে না। তারা দেখতে পাচ্ছিল, আর আই. এন-এর সবগুলো জাহাজের মাস্তুলে উড়ছিল ভারতীয় জাতীয় দলগুলির পতাকা।

তাহলে কেন নেতারা চাইছিলেন যে রেটিংরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটা যুদ্ধবিরতির চুক্তিপত্রে সাক্ষর করুক? তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন, যুদ্ধেতে "প্রায় দশটি রেটিং এবং পনেরটি টমীর মৃত্যু ঘটেছে।" বছরের পর বছর ধরে নৈরাশ্যময় অহিংস আন্দোলনের পরে, নৌবিভাগের ছেলেরা প্রমাণ করেছে যে অস্ত্র নিয়ে বৃটিশের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব এবং তার জন্য তারা গর্বিত। "এরা আমাদের নিজেদেরই ছেলে।" নেতাদের মত জনসাধারণ আমাদের পরিত্যাগ করেনি। তা সত্ত্বেও—যেদিনটি শুরু হয়েছিল কামানের আওয়াজ দিয়ে—সে দিনটি শেষ হলো কনফারেনস্ টেবিলে আইনের মারপ্যাঁচের দর কষাকষিতে।

২২শে ফেব্রুয়ারী, জনসাধারণের উদ্দেশ্যে পরস্পরবিরোধী আবেদন প্রকাশ হলো বিভিন্ন সংবাদপত্রে।

বামপন্থী দলগুলি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল সর্ববৃহৎ জাতীয় দলের পক্ষ থেকে সর্দার প্যাটেল বললেন: "কংগ্রেস যথাসম্ভব চেষ্টা করে চলেছে একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আসার জন্য......। ঘটনার এই বেদনাদায়ক আবর্তনের জন্য কে দায়ী—কিসে এই বিধ্বংসকারী পরিণতি ঘটলো......**তা জানা নেই**। প্রত্যেক দায়িত্বশীল লোকের প্রথম এবং সমূহ কর্তব্য হলো লক্ষ্য রাখা, যেন সহরটি গোলযোগে নিমজ্জিত না হয় এবং তার শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া অব্যাহত থাকে। জনসাধারণের পক্ষে সর্বোত্তম কাজ হবে, নিয়মমত তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম করে যাওয়া।" কংগ্রেসের শক্ত মানুষ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ও স্পষ্ট বক্তা সর্দার প্যাটেল তাঁর ভাষণে কোথাও সন্দেহের অবকাশ রাখলেন না। জেল থেকে সম্প্রতি বেরিয়ে তিনি ও তাঁর বন্ধুরা দেখলেন ব্রিটিশের সঙ্গে সমঝোতা করার সুযোগ আগের থেকে অনেক উজ্জল। তাঁর মতে এসব বোকা ছেলেরা (young fools')—ছিল চীনামাটির দোকানের সেই কিংবদন্তীর বলদের মত। আমাদের দিক হতে আমরা মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস করিনি যে বৃটিশদের সত্যি সত্যি ভারত ছেড়ে যাবার ইচ্ছা ছিল।

FOCRIN এর ভারতীয় নৌবহর ধ্বংস করার বর্বর

হুমকির পাশাপাশি সংবাদপত্রগুলি জনসাধারণের কাছে এন. সি. এস. সির. নিবেদনটিও প্রকাশ করে যাচ্ছিল—"নৌবিভাগের কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করুন গুলি ছোঁড়া বন্ধ করতে—তাদের বাধ্য করুন ভয় দেখানো বন্ধ করে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে।" যে অবস্থায় অ্যাডমিরাল রেটিংদের এনে ফেলতে চেয়েছিলেন, সে অবস্থাতেই তারা এসে পড়ল। তাদের সমকক্ষ মেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে বসার আর প্রয়োজন হলো না। ততক্ষণে জাতীয় নেতাদের চিন্তাধারা বিষয়ে তিনি বেশ একটা অভ্রান্ত ধারণা গঠন করে নিয়েছেন।

*

২২শে ফেব্রুয়ারীর সকাল ১১টা। FOCRIN-এর বার্তা র‍্যাটরে (Rattray) বেতার যোগে ঘোষণা করলেন। অবশেষে তাদের আকাঙ্খিত অতিরিক্ত সৈন্যদল এসে গেল—তারা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। তিনি বেতার বার্তায় চরমবাণী পড়ে শোনাতে লাগলেন—"আমি গতকাল তোমাদের বলেছিলাম, শৃঙ্খলারক্ষার কাজে প্রচুর সৈন্য পাওয়া যাবে। মহামান্য সর্বাধিনায়ক (His Excellency the C-in-C)। হুকুম দিয়েছেন,সাদার্ণ কমাণ্ডের জি. ও. সি(G. O. C.) যেন বম্বের সর্বোচ্চ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। প্রচুর ক্ষমতা সরকারের অধিকারে আছে একথা বোঝাবার জন্য তিনি হুকুম দিয়েছেন, রয়াল এয়ার ফোর্সের (R. A. F.) এর এক

ঝাঁক বিমানকে পোতাশ্রয়ের ওপর দিয়ে উড়ে বেড়াতে। ......আমার সতর্কতার বাণী অনুসারে যদি বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করাই স্থির করে থাকো তাহলে উড়িয়ে দাও সাদা অথবা নীল পতাকা—সবাই এসে জড়ো হয়ে দাঁড়াও বম্বে সহরের দিকে মুখ করে ডেকের ওপরে—পরবর্তী হুকুমের জন্য অপেক্ষা করো।"

যে সময়ে এই বার্তা ঘোষণা করা হচ্ছিল, তখন জনসাধারণ রাস্তায় বেরিয়ে এসে টমীদের সঙ্গে লড়াই করছিল। ভারতীয় সৈন্যদের সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নিয়ে ব্যারাকে আটকে রাখা হয়েছিল। মেসিনগান নিয়ে এবং ট্যাঙ্কের সাহায্য নিয়ে টমীদের ব্যাটেলিয়ানগুলি রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। জনসাধারণের হাতে কোন আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। তারা রাস্তা খুঁড়ে যেমন তেমন ভাবে ব্যারিকেড তৈরী করে তার পিছন থেকে পাথর ছুঁড়ছিল। তাদের কোন নেতা থাকলেও কেউ তাদের নাম শোনে নি। শত শত লোককে গুলি করেই ট্যাঙ্কগুলি রাস্তা পরিষ্কার করতে পেরেছিল। ২২শে ফেব্রুয়ারীতে যা ঘটেছিল তা ভারতের অন্যান্য সাধারণ গণঅভ্যুত্থানগুলো থেকে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। জাতি-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে বম্বের খেটে খাওয়া লোকগুলো সবাই একবারের মত রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। একটি দোকানও লুট করে নি—একটি ঘরও জ্বালানো হয় নি। খুন করার জন্য ছোরাও ব্যবহার করে নি। তারা কামানের

গোলার সম্মুখীন হয়েছিল পাথর নিয়ে—তারা গুলির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগলো। এই মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা কখনো প্রকাশ করা হয় নি। মৃত ও আহতের সংখ্যা ছিল চারশত থেকে আটশতর মধ্যে। কিন্তু এই বিষয়ে সবাই একমত যে বম্বেতে এর আগে একদিনে এত লোক প্রাণ বিসর্জন দেয় নি। ২১শে ফেব্রুয়ারী ছিল রেটিংদের দিন, কিন্তু ২২শে ছিল বম্বের শ্রমিকদের দিন।

শ্রমিকেরা যখন তাদের যুদ্ধ চালাচ্ছিল, রেটিংরা তখন কী করছিল? যেসব ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে আমার জানা আছে তারই মধ্যে আমি সীমাবদ্ধ থাকবো। রেটিংরা এন. সি. এস. সি. দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। কমিটির অধিকাংশ সভ্যগণ অন্ধভাবে জাতীয় নেতাদের অনুসরণ করতে আগ্রহশীল হয়ে পড়েছিল। আলোচনা সমিতি এক নেতা থেকে অপর নেতার কাছে চক্কর মেরে বেড়াচ্ছিল—এমনকি মুসলিম লীগের কাছ থেকেও উপদেশ ভিক্ষে করে বেড়িয়েছিল।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছিলাম বাইরের শ্রমিকদের সঙ্গে যোগদান করতে। সেটাই শেষ চেষ্টা। সন্দেহ নেই, আমরা যদি সংগ্রামী শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিতে চেষ্টা করতাম তবে আমরাও উড়ে যেতাম টুকরো টুকরো হয়ে। বৃটিশরা ধাপ্পা দিচ্ছিল না। তবে বৃটিশের সাথে জাতীয় নেতাদের দর কষাকষির বিষয়টা আমাদের সঙ্গেই উড়ে যেত। আমরা পাগলের মত ছুটোছুটি করতে

লাগলাম, 'তলোয়ার' ও 'ক্যাসাল ব্যারাকে' সবাইকে বোঝাতে লাগলাম পরিস্থিতির ও সঙ্কটের তাৎপর্য—এবং ঘটনাবলীর চ্যালেঞ্জ। "আমাদের ভাইদের রক্ত ঝরছে রাস্তায়—আমরা আত্মসমর্পণ করতে পারি না—তাদের ডুবিয়ে দিতে পারিনা—পারিনা দেশকে ডুবিয়ে দিতে।" এর ফলে সংগ্রামী মনোভাব বাঁচিয়ে রাখতে কিছু সময় পাওয়া গেল মাত্র। দুপুর দু'টার সময় এন. সি. এস. সি এক বার্তা পাঠালোঃ "যাই ঘটুক না কেন, সর্ত্তহীন ভাবে আত্মসমর্পণ করা হবে না। যা ঘটে ঘটুক।" এর পরে নাবিকেরা আলোচনা সমিতি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজী হলো।

আমাদের অবস্থা তখন শোচনীয়। সাধারণ অসন্তোষকে একত্র করে এক খাতে বইয়ে দিয়ে একটা বিদ্রোহ সৃষ্টি করে ছিলাম, চেষ্টা করেছিলাম তাকে বিজাতীয় শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে। কিন্তু আমাদের পরাজয় হলো। আমাদের পরাজয় ঘটেছিল, যেহেতু সৈন্য সংগঠন করেও আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম তার কার্যকারণ সঙ্গত অনিবার্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। আমাদের নেতারা ছিল বিচ্ছিন্ন হয়ে। জনসাধারণ তাদের ভাগ্য সমর্পণ করে দিয়েছিল আমাদের ওপরে। শতবছরেও যে সুযোগ আসেনি, সে সুযোগ লাভ করেও আমরা তাকে সদ্ব্যবহার করতে অপারগ হলাম। আমাদের আচরণ হলো বাচ্চা

শিশুদের মত—আগুন লাগিয়ে দিয়ে শেষে বড়দের কাছে সাহায্য চাইতে যাবার মত। আমাদের অভাব ছিল যোগ্যতার, নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে পড়ে থাকার শক্তির, আর অভাব ছিল বিচার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার। বিদ্রোহকে একটা নির্দিষ্ট রূপ দিতে হলে নেতৃত্বের চাই যেসব গুণ, আমাদের তার সবকিছুর অভাব ছিল—এটাই বাস্তব সত্য। রেটিংরা যখন ব্যারাক ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে ব্যর্থ হলো, তখনই বোঝা গেল আমরা পরাস্ত হয়েছি। হতাশায় ভেঙ্গে পড়লাম কান্নায়। আশা করার মত আর কিছুই ছিল না। আমরা শুধু চেয়েছিলাম বেদনার এই অধ্যায়টিকে ভুলে যেতে—বিস্মৃত হতে। আমাদের দিক থেকে, বিদ্রোহের এখানেই অবসান। যতদিন আমি আর. আই. এন. এ ছিলাম, ততদিন এবং পরে বহু বছর ধরেই আমার পক্ষে এ সম্বন্ধে আলোচনা অসহ্য ছিল। ঐ ব্যাপার নিয়ে কী হতে পারতো, কেন হয়নি এজাতীয় আলোচনায় বসা সম্ভব ছিল না, এমনকি আমার মায়ের সঙ্গেও না।

সন্ধ্যাবেলা খান ফিরে এলেন সর্দার প্যাটেলের কাছ থেকে বার্তা নিয়ে। ঢেউ রোধকারী বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি বাণী পাঠ করে শোনালেন জাহাজ গুলোকে: "বর্তমানে যে দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি উপস্থিত হয়েছে সে উপলক্ষে আর. আই. এন. এর প্রতি কংগ্রেসের নির্দেশ হলো, তারা যেন **অস্ত্র সম্বরণ করে এবং আত্মসমর্পনের জন্য যেসব**

রীতিনীতি ও আদেশ মেনে চলতে বলা হয়েছে সে সবই যেন মানা হয়।" খান এবং তার সহকর্মীদের চেহারাতে লক্ষ্য করা গেল, গত চারদিন ধরে প্রায় অনাহারে অনিদ্রায় থেকে ক্রমাগত কাজ চালিয়ে যাওয়ার অত্যধিক পরিশ্রমের ধকল। তাদের তখন স্থিরভাবে দাঁড়াবার পর্য্যন্ত শক্তি ছিল না। খানের নিজের উপদেশ, তার নিজের কাজের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই চলেছিল: "আমার অভিমত হলো প্রথমেই আমরা স্বীকৃত হয়েছি যে জাতীয় নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েই চলব আমরা। এখন যখন আমাদের বলা হয়েছে আত্মসমর্পণ করতে তখন আমাদের এরূপ করতেই হবে। আমরা ব্রিটিশের নিকট আত্মসমর্পণ করছি না—আমরা আত্মসমর্পণ করছি দেশবাসীর (people) কাছে।"

কমিটি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে, এবারই প্রথম আদেশ মেনে চলতে অস্বীকৃত হলো অধিকাংশ জাহাজীরা। আমার জ্ঞাতসারে এই প্রথম—একজন মুসলমান রেটিং খানকে জিজ্ঞেস করলো যে তিনি নিজে মুসলিম নেতাদের উপদেশ চেয়েছিলেন কিনা। আমার মনে হয়, এক সহজাত বৃত্তিতে পরিচালিত হয়েই বিপৎকালে স্বধর্মাবলম্বীর ওপরে শেষ প্রত্যাশা রাখার চেয়ে এটা আর বেশী কিছু নয়। ভারতের জনজীবনে যে ধরণের সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব দেখা যেতো, মোটেই সে ধরণের প্রতিফলন ছিল না এটা। খান দেখা করেছিলেন বম্বের মুসলিম-লীগ নেতা চুন্দ্রীগড়ের সাথে।

মুসলিম লীগ হাই কমাণ্ডের কাছ থেকে কোন নির্দেশ না পেলে কোন আশ্বাসদানের ক্ষমতা ছিল না তাঁর। মিঃ জিন্না ছিলেন কোলকাতায়।

এই সাধারণ প্রতিরোধের জন্য জাহাজগুলোকে বলা হলো তাদের মুখপাত্রদের 'তলোয়ারে' পাঠিয়ে দিয়ে বিষয়টির ফয়সালা করে নিতে। কড়া পাহারার ভিতর দিয়ে চলে আসবার জন্য পাসের যোগাড় হলো, ততক্ষণে রাত গেছে অনেক এগিয়ে। সহরের সীমানার বাইরের সংস্থাগুলো থেকে মোটেই সম্ভব হলো না লোক পাঠাবার। নৌ-কর্তৃপক্ষ যে সব 'পাস' প্রদান করেছিল, 'তলোয়ারে'র প্রবেশ পথের পাহারায় নিযুক্ত টমীরা সে সব 'পাস'কে অবজ্ঞা করাই পছন্দ করলো।

*　　　*　　　*

রাত একটায় ছত্রিশজন সভ্য সমবেত হলেন 'তলোয়ারে।' সে রাতটি ছিল মনোরম। চতুর্দিকে রেটিংরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিল। কারো চোখে—ঘুম ছিল না। কেউই কোন তর্ক বিতর্ক করছিল না। তাদের সব যুক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেছে। মনে হল এন. সি. এস. সি.-র উপরে তারা সম্পূর্ণ ভাবে ভবিষ্যতের ভার ছেড়ে দিয়েছে। নেতাদের এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কি কথাবার্তা হয়েছে, তার একটা মৌখিক বিবরণী দিলেন খান—আত্মসমর্পণের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত আবেদন জানিয়ে খান সাহেব তাঁর ভাষণ শেষ

করলেন। অশ্রুভারাক্রান্ত তাঁর চোখ। খান তাদের সামনে যে চিত্র তুলে ধরেছিলেন, মনে হলো, তাতে সভ্যগণ হতভম্ব হয়ে গেল। শুধু কয়েক মিনিটের নীরবতা—তারপরেই শুরু হলো হট্টগোল। প্রত্যেকেই দাঁড়িয়ে পড়লো কথা বলতে—কেউ আর কারও কথা শুনছে না। "নেতারা সব গোল্লায় যাক—আমাদের সাথে আছে জনসাধারণ; তারা রক্তপাত করে চলেছে আমাদের জন্য—আমরা তাদের সঙ্গে যোগ দেবো। হাঁ, আমাদেরও মরতে হবে—কিন্তু তখন রাস্তার ওপারে সংগ্রামরত ভাইদের সঙ্গে এসে যোগ দেবে স্থল ও বিমান বিভাগের ভাইয়েরা। সাবধানী বৃদ্ধ নেতাদের কথা শুনো না। জনসাধারণ আমাদের পথ দেখিয়েছে—ভারতের স্বার্থে ও আমাদের নিজেদের স্বার্থে আর একবার সাহসের সাথে বেরিয়ে পড়।" এই রকম ছিল মনোভাব। আমিও ছিলাম সেখানে—এক নির্বাক দর্শকরূপে। আমার ভিতরটা বোধ হলো ফাঁকা—অবসন্ন এবং এসব ক্রিয়াকলাপে মানসিক দিক দিয়ে বিস্ময়কর ভাবে নির্লিপ্ত। যদি তাদের এই বোধটা আরো—তিনদিন কি দুদিন এমন কি সেদিন সকালেও আসত!

মাথাটা দুহাতে চেপে ধরে খান এবং মদনসিংহ সব শুনছিলেন। শেষে ভোর চারটার সময়ে টলতে টলতে দাঁড়িয়ে উঠলেন খান।

ক্লান্ত, অশ্রু বিজড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন "আর নষ্ট

করার সময় নেই।" তিনি তাদের আস্থা রাখতে বললেন। তারা নৌবিভাগ দখল করেছে ও রক্ষা করছে জাতির অছি হিসাবে। তারা ঠিক করেছিল যে তারা—শুধু জাতীয় নেতাদের কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করবে। এখন যদি তাঁদের নির্দেশ অমান্য করে তবে তারাই বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে দায়ী হবে। এমন কি এই বলে তাদের ওপর দোষারোপ করা হবে যে তাদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ছিল—সেটা হবে আরো মারাত্মক। তাদের একমাত্র উচ্চাভিলাষ ছিল স্বাধীন ভারতের নৌবিভাগে কাজ করার। সভ্যগণ ছিলেন নিশ্চুপ দ্বিধাগ্রস্ত। অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে মনের দ্বিধাগুলির মোকাবিলা করার শক্তি কারও ছিল না।

একজন বার্তাবাহক ছুটে এলো। সবেমাত্র ফ্রি-প্রেস-জার্নেল জিন্নার একটি বার্তা ফোনে জানিয়েছে। মিঃ জিন্না তখন ছিলেন কোলকাতায়। তিনি সংবাদ পত্রে এক বিবৃতি দিয়েছেন ঃ

"আর. আই. এন. এর লোকেদের ওপর যাতে ন্যায় বিচার হয় তার জন্য আমি অকুণ্ঠিতভাবে লক্ষ্য রাখবো। তারা যদি আইনসংগত এবং শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন করে থাকে—এবং তারা যদি আমাকে সম্পূর্ণভাবে জানায় কিসে তারা সন্তুষ্ট হবে, তাহলে তাদের আশ্বাস দিচ্ছি, তাদের অভিযোগ পূরণের জন্য আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো ......। আর. আই. এন. এর লোকদের কাছে আমি

আবেদন (appeal) জানাচ্ছি, ধর্মঘট তুলে নেবার জন্য ‥ বিশেষ করে মুসলমানদের অনুরোধ করছি ধর্মঘট বন্ধ করতে…।” মুসলিম নেতাগণ মুসলিম রেটিংদের স্মরণ করিয়ে দিল যে তাদের উচিত শুধু ওঁর উপদেশ মেনে চলা—আর কারো নয়। আগেই কংগ্রেস নেতারা আমাদের জানিয়েছিলেন যে রেটিংদের মধ্যে মুসলমান থাকায় মুসলিম লীগের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। রাজনীতিবিদদের এটা জানবার জন্য কোন আগ্রহ বা মাথাব্যথা দেখা গেলনা, বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলি কেন একে আন্যর প্রতি কামান দাগছিলেন তা রেটিংদের বড় একটা জানা ছিল না। তাদের জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট দিনগুলো কেটেছে একত্রে বাস করে, এক খাবার খেয়ে, একই সুখদুঃখের শরিক হয়ে। নেভীর দিনগুলো তাদের মন থেকে সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন মুছে দিয়েছে।

তখনই খান দাঁড়িয়ে উঠে বললেনঃ “এখন আমাদের আর দ্বিধা করা উচিত নয়। উভয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানই দৃঢ়ভাবে তাদের সমর্থন জানিয়েছে। এমনকি আই. এন. এর লোকদের বিচারে আত্মরক্ষার ব্যাপারেও উভয়দল মিলিত হতে পারি নি। আমাদের জয় হলো।” কেউ কেউ তাঁর মতই মনে করলেন। অন্যরা নিরাশ হয়ে পড়লেন, মিঃ জিন্নার সমর্থনের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার লক্ষণ দেখে। সংগ্রামী অংশও সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে বিপদ দেখতে পেলো।

যদিও আমাদের উদ্দেশ্য বিষয়ে আমরা একমত হতে পারি নি কিন্তু চারদিন ধরে যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছিলাম আমরা একতাবদ্ধভাবে। আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিয়েই মিঃ জিন্না তার বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন।

সকাল ৬টায় আত্মসমর্পণের পতাকা তোলার কথা ছিল। এখন প্রায় ভোর ৫টা। ভারাক্রান্ত অন্তরে সভ্যগণ একে অন্যকে আলিঙ্গন করলেন—ছুটে গেলেন নিজ নিজ জাহাজে ব্যারাকে—সব শেষ হয়ে গেল। ব্যথিত অন্তরে পা টেনে এগিয়ে গেলাম আমার শেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাজির হতে। আমি সমস্ত কাগজপত্র একত্র করে নিলাম—সংগ্রহ করে নিলাম প্রতিটি কাগজের টুকরো যেগুলো এন. সি. এস. সির সভ্যরা ব্যবহার করেছিলেন। সেগুলো আগুনের মধ্যে ফেলে দিলাম—চোখের জলে আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। সে সময়ে আমি চেয়েছিলাম আমাদের শোচনীয় ব্যর্থতার সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ নষ্ট করে ফেলতে।

চলে যাওয়ার আগে, জন[illegible]র উদ্দেশে এন. সি. এস. সি শেষ বাণী পাঠালো ঃ

"কেন্দ্রীয় নৌধর্মঘট কমিটি ভারতের জনগণকে—বিশেষ করে বঙ্গের জনগণকে জানাতে চান যে ধর্মঘট-কমিটি ধর্মঘট তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করার পরেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

"তিনি (প্যাটেল) তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে কোন প্রকারেই কোন ধর্মঘটীকে পরে শাস্তি পেতে না হয়, কংগ্রেস তা দেখবে, তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। কংগ্রেস তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। মিঃ জিন্নার সহানুভূতিপূর্ণ বিবৃতির পরে মুসলিমলীগের সমর্থনের নিশ্চয়তার ওপরে নির্ভর করেও কমিটি স্থির করেছে ধর্মঘট উঠিয়ে নিতে।"

বার্তার শেষ কথাগুলো ছিল ঃ

"আমাদের জনগণের কাছে আমাদের শেষ কথা ঃ আমাদের জাতীয় জীবনে, আমাদের ধর্মঘট এক ইতিহাস সৃষ্টিকারী ঘটনা। এই প্রথম বার জনগণের এবং সৈনিকগণের শোণিত একত্রে মিলিত হয়ে বয়ে চলেছে এক সাধারণ উদ্দেশ্যে। আমরা সৈনিকরা এই ইতিহাস কখনো ভুলব না। আমাদের ভাই ও ভগ্নিগণ, তোমরাও যে ভুলবে না, তাও আমরা জানি। আমাদের মহান জনগণ দীর্ঘজীবী হোক। জয়হিন্দ।"

জনগণের প্রতি এটাই অবশ্য ছিল তাদের শেষ বাণী। বহুশ্রুত "silent service" আবার ২৩শে ফেব্রুয়ারীর প্রভাতে মৌন হয়ে গেল। এক লোহার পরদা শক্ত করে এঁটে দেওয়া হলো আর. আই. এন. এর ওপরে। কেউ কখনো জানতেও পারে নি কত হাজার জনকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল—কি ধরণের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তাদের।

এমন কি রেটিংরাও জানতে পারে নি একে অন্যের ভাগ্যে কি ঘটেছিল। আমার হিসাব মতে, দু'হাজারেরও বেশী রেটিংকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জাহাজ ও ব্যারাক থেকে—কয়েক মাস ধরে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল। পাঁচশয়ের মত লোককে কারাবাসের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। সাধারণ কয়েদীদের মত তারা করেছিল কারাবাস। এমনকি রাজনৈতিক কয়েদীর মর্যাদা থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হয়েছিল। সমস্ত ন্যায়সঙ্গত পাওনা থেকে বঞ্চিত করে জেল থেকে তাদের যার যার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা নিমজ্জিত হলো বিস্মৃতির অতলে।

আমাদের জাহাজগুলোর অদৃষ্টও এর চেয়ে আর ভাল ছিলনা। 'তলোয়ারে' আর রইলো না সিগন্যাল স্কুল বলে কিছু—নামটা মুছে গেল। নৌ-বিভাগের খাতা থেকে 'ক্যাসেল ব্যারাকের' নামটাও বাদ দেওয়া হলো। নৌ-বিভাগের বখরা হিসেবে পাকিস্তান পেলো নর্মদা। আমাদের অধিকাংশ বন্ধুদের মত আমার কাছেও হারিয়ে গেল 'হিন্দুস্থান' এবং অন্যান্য জাহাজের গতিপথ। এই জাহাজগুলো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল 'নৌ-অভ্যুত্থানে'।

সবার শেষে অনেক নোংরা গুজব ছড়ান হয়েছিল রেটিংদের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে তাদের নিস্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ও জনগণের কাছ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল। তারা দেশবাসীকে জানাতে পারেনি যে—তারা

কোন অফিসারের সঙ্গেই অসৎ ব্যবহার করেনি—জাহাজের বা কোন অফিসারের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র বা টাকা-পয়সা স্পর্শ করেনি। সমস্ত যুদ্ধোপকরণ, আগ্নেয়াস্ত্র আসবাব, কোডবুক—সবই পাওয়া গিয়েছিল নির্দিষ্ট জায়গায়—চারদিন ধরে আর. আই. এন.-এর সম্পত্তিকে রেটিংরা জাতীয় সম্পত্তি বলে মনে করেছিল। পরে আমরা সমস্ত কিছু বলার সুযোগ পেয়েছিলাম—যখন প্রকাশ্য তদন্তে আমাদের সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়েছিল। বিদ্রোহে আমাদের যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল তা যদি আমরা প্রকাশ করে দিতাম তাহলে আমাদের যে সব আস্থাবান বন্ধু আমাদের গুপ্ত কাজে কিছু সাহায্য করেছিলেন—তাদের বিপদ ঘটতো। তা প্রকাশ না করার জন্যই আমাদের প্রতি নির্দেশ ছিল। এ নির্দেশের বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না আমাদের। তখনো আমরা আমাদের নিজেদের অকৃতকার্যতার লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম। কাউকেই দোষারোপ করিনি আমরা। মত পার্থক্যের কথা ছিল বটে, নিকৃষ্ট খাবারের কথা ছিল, ছিল চাকরীর অস্বাস্থ্যকর অবস্থার কথা—কিন্তু কোন রাজনীতি নয়। এভাবে রাজনীতি বর্জন করেই দিলাম আমরা সাক্ষ্য। সে সময়ে মনে হচ্ছিল, যেভাবেই হোক, ভারত স্বাধীনতা পেতে যাচ্ছে। আমরা যে প্রচেষ্টায় রত হয়েছিলাম—আর কারো পক্ষে প্রয়োজন ছিল না—সম্ভাবনাও ছিলনা—সে কাজ আবার চেষ্টা করার। আমাদের ব্যর্থতা, আমাদের লজ্জা,

কেন আরোপ করা হবে নেতাদের সুখ্যাতির ওপরে? সব-কিছুই অব্যক্ত রইলো, আমরা কিছুই প্রকাশ করলাম না।

* * *

বম্বের বাইরে করাচী ছিল একমাত্র জায়গা যেখানে প্রকৃত সংগ্রাম ঘটেছিল। সেখানে ছিল তিনটি তীরাবস্থিত (shore establishment) 'বাহাদুর', 'হিমালয়' ও 'চম্পক': দুটি যুদ্ধ জাহাজ: 'হিন্দুস্থান' ও কর্ভেট 'ত্রিবাঙ্কুর'। বম্বের মতই যেভাবে যুদ্ধ করা উচিত ছিল সেভাবে তারাও যুদ্ধ করেনি। যুদ্ধ যখন তাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হলো, তখন 'হিন্দুস্থান' যুদ্ধ করলো বীরের মত। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত গোর্খা সৈন্যরা অস্বীকার করলো 'হিন্দুস্থানের' প্রতি গুলি ছুঁড়তে। এখানেও ভারতীয় সৈন্যদের স্থানে আনা হলো বৃটিশ সৈন্য। 'হিন্দুস্থানের' ওপরে তখনই ওরা আক্রমণ করলো যখন ডাঙ্গাতে আক্রমণকারীদের উপর সেই জাহাজে থেকে তার কামানগুলি ব্যবহার করা চলছিল না, যেহেতু ভাটায় জাহাজঘাটায় জল অনেক নীচে নেবে গিয়েছিল। রেটিংরা কামানের গোলায় পর্যুদস্ত হয়েছিল। আরো খারাপ হল, যে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ল। আধঘণ্টা যুদ্ধ হয়েই সব শেষ হয়ে গেল। তাদের বেপরোয়া সাহসই ছিল একমাত্র উল্লেখযোগ্য। তাদের অদ্ভুত সাহসকে এমনকি আক্রমণকারী টমীদেরও প্রশংসা করতে হয়েছিল।

গভীর সমুদ্রে যেসব জাহাজ ছিল, তাদের মধ্যে ছোট্ট

করভেট "কাথিয়াড়ের" ব্যবহার ছিল অন্যান্য সকল 'আর. আই.এন. জাহাজেরই মত। রেডিও চালক ধর্মঘটের এবং 'হিন্দুস্থান' জাহাজের ওপরে সম্ভাব্য আক্রমণের সংবাদ ধরতে পেরেছিল। জাহাজটি ছিল পশ্চিম উপকূলের অদূরে কোন স্থানে। একঘণ্টার মধ্যে রেটিংরা এসে জাহাজের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করলো। তারা চেয়েছিল 'হিন্দুস্থানের' পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। ক্যাপ্টেনকে হুকুম দেওয়া হলো জাহাজটিকে করাচী নিয়ে যেতে। ক্যাপ্টেন অস্বীকার করলো। জাহাজ চালাতে অফিসারের সাহায্য পাবার জন্য কিছু সময় নষ্ট হলো। ইতিমধ্যে খবর এসে গেল 'হিন্দুস্থান' আক্রান্ত হয়েছে। অফিসারের সঙ্গে যুক্তিতর্ক করবার জন্য তারা আর সময় নষ্ট করলো না। মাত্র একজন রেটিং-এর নৌ-বিদ্যার প্রাথমিক ধরণের জ্ঞান ছিল। অফিসারদের ওয়ার্ড-রুমে বন্ধ করে তারা রওয়ানা হলো করাচী অভিমুখে। কিন্তু শীঘ্রই তারা বুঝতে পারলো গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে তাদের বিলম্ব হবে খুব বেশী। তাই তারা গতির দিক পাল্টে দিল ঝড়ের কেন্দ্রস্থল বম্বের দিকে।

জাহাজকে অসংযতভাবে চালনা করায়—অফিসাররা ঘাবড়ে গেল। অবশেষে ক্যাপ্টেন স্থির করলো, বম্বে অবধি চালিয়ে নিয়ে যেতে রেটিংদের সাহায্য করবে। বিপরীত ভূমিকায় তিনি এসে দাঁড়ালেন জাহাজের ব্রীজের ওপরে। তিনি তাঁর নিজের রেটিংদের কাছ থেকে নির্দেশ নিচ্ছিলেন।

ভারতের প্রথম স্বাধীন যুদ্ধজাহাজ পরিচালনা করায় রেটিংরা গর্ববোধ করলেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী বম্বের নিকটে এসে গেল 'কাথিয়াড়'। বন্দরের কাছাকাছি পৌঁছালে, বম্বের ফ্লাগ অফিসার হুকুম দিলেন, প্রবেশপথে অবস্থিত লাইট হাউসের পনের মাইল দূরে জাহাজকে নোঙ্গর করতে। সেদিন ভোরে সকল জাহাজকেই বন্দরে প্রবেশ করতে বাধাদান করা হয়েছিল। রেটিংরা ক্যাপ্টেনকে হুকুম দিল বন্দরের দিকে এগিয়ে যেতে। ক্যাপ্টেনের অন্য কোন উপায় ছিল না।

'কাথিয়াড়' বন্দরের দিকে এগিয়ে এলে রয়েল নেভীর ক্রুজার "গ্লাসগো" চেপে আসলো তার উপরে। ছোট্ট জাহাজটি তার ক্ষুদে ১২ পাউণ্ডার কামান "গ্লাসগোর" দিকে উঁচিয়ে তুলে চলে গেল পার হয়ে! ক্রুজার আঘাত না করে সম্মান দেখালো ক্ষুদে জাহাজের সাহসকে।

বম্বেতে বা বম্বের বাইরে, তীরে বা সমুদ্রে—সব জায়গা থেকেই সাড়া দিয়েছিল রেটিংরা এন্.সি.এস.সি-এর ডাকে। ভারতে বৃটিশ রাজত্বের অবসান কল্পে তাদের চাকচিক্যহীন সরল এবং স্বার্থহীন প্রচেষ্টা কিছু সময়ের জন্য জনগণকে বিচলিত করেছিল। সর্বত্রই রেটিংগণ উত্তোলিত করেছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের একত্রিতবদ্ধ পতাকা। ব্যারিকেডের পিছনে ছিল যেসব জনতা, তাদের মধ্যে সংক্রামিত হল এই জাতীয় একতাবোধের আকাঙ্খা। ভারত উপমহাদেশে

শেষবারের মত তারাও পতাকাগুলো একসঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলছিল। রেটিংরা যদি আত্মসমর্পণে স্বীকৃত না হতো, তাহলে ভয়ঙ্কর রক্তপাত হত। বহু সম্পত্তির ক্ষতি হত। কিন্তু ভারত বিভাগের প্রাক্কালে এবং স্বাধীনতার অর্ধ বৎসর বাদে যে বিভীষিকা, যে বিকৃতি এসে গ্রাস করেছিল ভারতকে, তার তুলনায় এই ক্ষতি ও মৃত্যু হত নেহাৎই নগণ্য।

*   *   *

রাজনীতিতে 'হতে পারতো'—এর মূল্য সন্দেহাতীত নয়। কোথায় এবং কিভাবে আমাদের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারতো, সে কথা বলা কঠিন। আমরা যদি আত্মসমর্পণ না করতাম, তাহলে হয়তো জাতীয় আন্দোলন ভায়ে— ভায়ে যুদ্ধের দিকে না গিয়ে অন্য কোন পথে যেতে পারতো। হয়ত ভারত-বিভাজন এড়ানো যেতো। বৃটিশ, ভারত থেকে সরে যাবার প্রাক্কালে, উপমহাদেশে যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তার জন্য যে সব নেতা দায়ী ছিলেন, এই বিরাট ঘটনা প্রবাহের মধ্য থেকে হয়তো তাঁদের চেয়ে ভিন্ন ধরণের নেতার আবির্ভাব হতো।

আমাদের আত্মসমর্পণের তিনমাস বাদে বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করার জন্য এক তদন্ত কমিশন গঠন করা

হয়েছিল। ততদিনে আমাদের চিহ্নিত করা হয়েছে "নৌ-বিদ্রোহী" বলে। তিনজন ভারতীয় বিচারক এবং বৃটিশ সামরিক অফিসারের দ্বারা এই কমিশন গঠিত ছিল। বৃটিশ সৈন্যদের প্রতিনিধিত্ব করেছিল—Vice Admiral W. R. Patterson, Flag Officer Commanding, Cruiser squadron of the East Indian Fleet and Major-General T. W. Rees, Commander. Fourth Indian Division. কমিশন একটি ৬০০ পৃষ্ঠার বিবরণী তৈরী করলো এবং সেটাকে গোপন রাখা হলো জনসাধারণের কাছ থেকে। ঘটনার প্রায় একবছর বাদে, জনসাধারণের অনেক আন্দোলনের পরে বিবরণীর কাট-ছাট্ দেওয়া একটা ভাষ্য সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়েছিল। সামান্যই প্রকাশ পেয়েছিলো তাতে। আমরা নিজেরাই চেপে গিয়েছিলাম রাজনৈতিক দিকটা। সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে উল্লেখ ছিলনা রাজনীতির কোন কথা। আমরা খুশী ছিলাম আমাদের লজ্জা ঢেকে রেখে; জাতীয় নেতারা খুশী ছিল বিব্রত হওয়া থেকে অব্যাহতি পেয়ে। সংক্ষেপে বলা যায়, যে বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হলো তাতে এটাই প্রকাশ পেলো যে অভ্যুত্থানটিতে প্ররোচনা জুগিয়েছিল কিছু আশাহত অসন্তুষ্ট রেটিংগণ এবং তাদের অভিযোগ ছিল কম ও নোংরা চাল ও ডাল দেওয়ার বিরুদ্ধে। ততদিনে ভারত বিভাগের বিষয় নিয়ে জনসাধারণ খুব বেশী জড়িয়ে পড়েছে।

মাস তিনেক বাদে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট রাতে জহরলাল নেহেরু যখন প্রচার করেছিলেন: "বহু বছর আগে আমরা আমাদের ভাগ্যের সঙ্গে লড়াইয়ে নামি; এখন সময় এসেছে আমাদের প্রতিজ্ঞা সফল করার—সম্পূর্ণভাবে বা পুরোপুরিভাবে নয়—কিন্তু বেশ ভালভাবেই," তখন আমরা হয়ে পড়েছি জাতির একটি অস্বস্তিকর স্মৃতি মাত্র।

পরিশিষ্ট

নামকরণ

এই ছোট পুস্তকটির লেখক শ্রী বি. সি. দত্তের পুরো নাম, শ্রীবলাই চন্দ্র দত্ত। বর্ধমান জেলার কোন এক গণ্ডগ্রামে এঁর জন্ম। নৌবিদ্রোহের সময় এঁর বয়স ছিল মাত্র ২০ বৎসর। ইনিই সর্বপ্রথমে "জয়হিন্দ" ধ্বনি তোলেন বলে অভিযুক্ত হন—২রা ফেব্রুয়ারী বন্দী হন। এঁকে গ্রেপ্তার করা থেকে বিক্ষোভ ধীরে ধীরে মূর্ত্তিমান হয়ে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের প্রকাশ্য আকার ধারণ করে। টেলিগ্রাফিষ্ট আর. কে. সিংএর সত্যাগ্রহকেই প্রথম পদক্ষেপ বলা চলে। সিংহ ডিসেম্বর মাসেই প্রকাশ্য প্রতিবাদ করে কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগ-ভাজন হন। একথা স্মরণে রাখা দরকার বিদ্রোহীদের নেতা বলে যাঁরা পরিচিত হয়েছেন, বা কেন্দ্রীয় স্ট্রাইক কমিটির সদস্য যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কারুর বয়সই ২৩।২৪-এর বেশী ছিলনা। এই বৃহৎ ব্যাপারটি রাজনীতিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ যুবকদের দ্বারাই সংগঠিত হয়েছিল।

লেখক শ্রীদত্ত সুন্দর ইংরাজীতে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি রচনা করেন। সেই পাণ্ডুলিপির ইংরাজী শিরোনামা হল, রিভোল্ট অব দি ইনোসেণ্টস্, (Revolt of the Innocents)। এই সুন্দর নামকরণটির সুষ্ঠু বঙ্গানুবাদ করা সম্ভব হয়নি বলে আমরা নামকরণ

করেছি 'নৌ-বিদ্রোহ'। নাবিকেরা যা করেছিলেন, তাকে ঠিক মিউটিনি (Mutiny) বা বিদ্রোহ বলা যায় কি-না, এ তর্ক আছে।

ব্রিটিশ সরকার সৈন্যবাহিনীতে ধর্মঘটের অধিকার কখনই স্বীকার করতে পারে না এবং ধর্মঘট যদি সৃষ্টি হয়ও তাকে **Mutiny** বলে আখ্যায়িত করে দমন করার চেষ্টা করবেই। প্রকৃত ঐতিহাসিক বিচারে এই ঘটনাটি ধর্মঘট হিসাবেই গৃহীত হবে, যদিও সশস্ত্র নাবিকদের ধর্মঘট। একথা স্মরণে রাখা কর্তব্য যে এই ধর্মঘট প্রথমেই অস্ত্রহাতে বিদ্রোহের আকার ধারণ করেনি। বরং সশস্ত্র নাবিকেরা অস্ত্র ত্যাগ করে অনশন দিয়ে ধর্মঘট শুরু করেন। সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের পক্ষে নিজেদের স্বেচ্ছায় নিরস্ত্র করে অনশন ধর্মঘট করা—এই চরম গান্ধীবাদী দৃষ্টান্তটি মহাত্মা গান্ধীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি দেখে আজ আশ্চর্য বোধ করা যায়। এটা ইতিহাসের একটি নিষ্ঠুর পরিহাসও বটে! মহাত্মা গান্ধী অভিযোগ করেছিলেন যে ধর্মঘটী নাবিকেরা অহিংসার পথ নেয়নি, যদি নিত, এবং যদি তাদের প্রতি ব্যবহার তাদের ও দেশের আত্ম-সম্মান বোধের হানিকর হয়ে থাকে, তবে তাদের কাজে ইস্তফা দেওয়াই উচিত ছিল। মহাত্মা গান্ধীর একথা স্মরণ করা উচিত ছিল যে সৈন্যবাহিনীতে বা নৌ-বাহিনীতে কারও পদত্যাগ বা কাজে ইস্তফা দেওয়ার অধিকার থাকে না।

যাই হোক, এই অনশনব্রতী নৌ-বাহিনীর রেটিংরা শেষ পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টার জন্য অস্ত্র হাতে নিয়ে লড়তে বাধ্য হন, কিন্তু

অস্ত্রশক্তির সুবিধাগুলি তখন তাঁদের হস্তচ্যুত। আর প্রতিপক্ষ প্রতিআক্রমণে সমুদ্যত ও অনেকটা প্রস্তুত। কেমন করে একটি নিরীহ অনশন শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের আকার নিল? এবং সেই বিদ্রোহ কেমন করে তার রাজনৈতিক পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হতে অসমর্থ হল, তার বর্ণনা এই অনভিজ্ঞ বিদ্রোহী যুবক বলাই দত্তের চোখে যতটুকু ধরা পড়েছে তার সমর্থনে আমরা এই পুস্তকের পরিশিষ্ট অংশে বিভিন্ন নেতা, দল, উপদলের কার্যকলাপ ও বিবৃতির ঐতিহাসিক রেকর্ড তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করে দিলাম।

এই ধর্মঘট নেহাৎ সাধারণ ধর্মঘট নয়, সেদিনের সেই সর্বভারতীয় বিপ্লবের বাতাবরণে নৌ-বাহিনীর রেটিংদের অনশন ধর্মঘটটা ত' দূরের কথা, ভারতে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত জনজাগরণের প্রতিটি পদক্ষেপ বৈপ্লবিক আগ্নেয়গিরির দ্যোতক হতে বাধ্য। সামান্য ঘটনাটিও অসামান্য তাৎপর্যবহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রিভোল্ট অব দি ইনোসেন্টস (Revolt of the Innocents)-এর বাংলা অনুবাদটির নামকরণ হয়তো 'অবোধ বিদ্রোহ' বললে খুব অন্যায় হত না। তবু পাঠক-পাঠিকারা হয়তো অবোধ ও নির্বোধের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে না-ও পারতেন, এবং ভারতের ইতিহাসের গর্ভে ক্রমবর্ধমান বিপ্লবের আত্মপ্রকাশ শৈশবকালীন অবোধ আকৃতির তাৎপর্য না-ও ধরতে পারেন —পণ্ডিত নেহরুর মত সবটাকেই অর্বাচীন শিশু-রোগ বলে আখ্যায়িত করতে পারেন, সেজন্যই আমরা 'অবোধ বিদ্রোহ'

কথাটি ব্যবহার না করে বহু প্রচলিত 'নৌ-বিদ্রোহ' কথাটিই ব্যবহার করলাম।

মিউটিনি

রেটিং-রা বিদ্রোহ করেছে কি-না, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত নেহরু ২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৬) বোম্বেতে বলেছিলেন,—

"আমি জানি সশস্ত্র বাহিনীতে ধর্মঘট বলে কোন শব্দ নেই। সেখানে হয় সব কিছুই ডিসিপ্লিন (Discipline), নয়তো মিউটিনি (Mutiny)। যদি সেখানে দুটি ব্যক্তিও একটি যুক্ত দরখাস্ত করেন, তবে সেটাকে মিউটিনি বলে ধরা হয়। যে কোন প্রতিবাদপত্র অথবা সম্মিলিত চিঠি এ জগতে মিউটিনি বলেই আখ্যাত হয়। যাঁরা ইংরিজি জানেন, তাঁরাই বলুন এই ঘটনার জন্য কোন শব্দটি ব্যবহার করা উচিত। আমার কাছে ঘটনার প্রতিশব্দ কোন উদ্বেগ সৃষ্টি করছে না। কিন্তু, একথা অত্যন্ত সহজবোধ্য যে, যেখানে নিয়ম শৃঙ্খলা এত কঠোর যে অত্যন্ত ভদ্রভাবে লিখিত একটি যুক্ত-আবেদনও নিয়মভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়, সেখানে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অগ্রসর হওয়ার কোন পথ থাকে না। সেখানে হয়তো তথাকথিত 'মিউটিনি' করা ছাড়া পথও কিছু থাকে না। হয় সেখানে কিছুই করার উপায় নেই, নয়তো, অফিসিয়াল ভাষায় যাকে মিউটিনি বলে তাই-ই করতে হয়।"

সীমাবদ্ধ পরিস্থিতি

শ্রী দত্ত তাঁর নিজের পরিপ্রেক্ষিত থেকেই যতটা দেখতে পেয়েছেন তাই লিপিবদ্ধ করেছেন। নৌ-বিদ্রোহের সর্বভারতীয় সব তথ্যের আনুপূর্বিক বর্ণনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। বিশেষ করে নৌ-বিদ্রোহ অবসান হবার সাথে সাথে তাঁকে অন্যান্যদের সাথে অন্তরীণাবদ্ধ হতে হয়—তাই ঘটনার ধারা-বাহিকতা অনুসরণ করার সুযোগও থাকে না—তাছাড়া সেই পরিপূর্ণ হতাশার মধ্যে নিজেদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাসের মূলেও আঘাত করে—সমস্ত ঘটনাটা একটা দুঃস্বপ্ন মনে করে সবাই ভুলবার চেষ্টা করেন।

রুশ বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে

"রুশ বিপ্লবের ইতিহাস" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে ট্রটস্কী একখানে লিখেছেন, যুদ্ধের পূর্বে (১৯১৪-১৮) রাশিয়াতে শ্রমিক-চাষী আন্দোলন বিস্তৃত ও তীব্র হয়, বলশেভিক পার্টির সদস্য সংখ্যাও খুবই বাড়ে, ধর্মঘট প্রায়ই দেখা দেয়, কিন্তু যুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গে সে সব সংগ্রাম বন্ধ হয়ে যায় বলা যায়, সংগ্রামী কর্মীদের অনেকেই যেন যুদ্ধের ডামাডোলে কোথায় হারিয়ে গেল ; ধর্মঘটের হার দ্রুত কমে যেতে থাকলো, পার্টির কাজকর্মও যেন শিথিল হয়ে গেল, জনসাধারণের চেতনা যুদ্ধের উত্তেজনা, স্বদেশপ্রেম ও দেশরক্ষার আওয়াজে যেন বিলীন ও নিস্তব্ধ। তবে কি যা কিছু রাজনীতি, শ্রেণী-সংগ্রাম সবই

ফাঁকা কথা, জনচিত্তে তার কি কোনোই স্থায়ী মূল্য নেই, নির্ভরযোগ্য মূল্য নেই ? ১৯১৭ সাল যেই এলো, যুদ্ধক্লান্ত চাষী ও মজুরেরা যারাই যুক্তফ্রণ্ট সৈনিক, নাবিক হিসাবে লড়ছিল—লক্ষে লক্ষে দেখা গেল তারা কিছুই ভোলেনি। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের শিক্ষা দীক্ষাও ভোলেনি, আর ভোলেনি তার পরের নিত্যদিনের সংগ্রামের কথা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বলশেভিক পার্টির কথাও ভোলেনি। 'যুদ্ধ চাইনা—শান্তি চাই—জমি চাই'—ইত্যাদি বাণীর মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় যে বিপ্লব সুরু হলো—তা দেখা দিল সমস্ত সীমান্তেও। সীমান্ত ছেড়ে হাজারে হাজারে লক্ষে লক্ষে দেশের ভিতর পানে অস্ত্র হাতে ছুটছে বিদ্রোহী নাবিক ও সৈনিকেরা।

তাদের বিপ্লবী পদধ্বনির ক্রমবর্ধমান আওয়াজ আসছে পেট্রোগ্রাদ ও মস্কোর দিকে। ট্রটস্কী তাঁর অনবদ্য অননুকরণীয় ভাষায় সীমান্ত ফেরৎ বিদ্রোহী সৈনিকদের সেই দৃপ্ত পদধ্বনি অপূর্ব ভাষায় ফুটিয়ে তোলেন। আর কেমন করে জীবনের কঠিন সংগ্রামে পাওয়া অভিজ্ঞতাগুলিকে, অতীত সংগ্রামের যাবতীয় শিক্ষা-দীক্ষাকে কাজে লাগিয়ে তারা নিজেরাই সর্বত্র সোভিয়েৎ বা বিপ্লবের হাতিয়ার ও পাল্টা সরকারের বুনিয়াদ রচনা করে যাচ্ছে —বলশেভিক পার্টির হুকুমের অপেক্ষাও রাখছে না—সে চিত্রও ফুটিয়ে তোলেন।

নৌ-বিদ্রোহের তাৎপর্য

ভারতের নৌ-বিদ্রোহেরও সেই তাৎপর্যই ছিল, যুদ্ধ শেষে

নাবিক, সৈনিক, শ্রমিক, বৈমানিক সবারই মধ্যে বিদ্রোহ প্রবণতা জেগে উঠেছিল ; হারিয়ে যাওয়া জাতীয় সম্বিৎ ও শ্রেণীচেতনা মাথা তুলে উঠেছিল। আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর কার্যকলাপের ইতিহাস যখন প্রকাশ হয়ে পড়লো তখন এদের চেতনায় আগুন ধরে গেল, ১৯৪২ সালের পরাজিত সংগ্রামের প্রতিশোধ নিতে দেশের সর্বত্র একটা জাগরণ দেখা দিল। যুদ্ধের দ্বারা—সে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই হোক আর 'জনযুদ্ধ'ই হোক—তারা যে কত প্রতারিত হয়েছিল তা তারা বুঝতে পেরেছিল। নেতাজী সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচারের অভিসন্ধিটা যে কত জঘন্য ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রজাত ছিল সে প্রত্যয়ও তাদের হলো।

সীমান্ত ফেরৎ রুশ-নাবিক ও সৈনিকদের বিদ্রোহ বিপ্লবে পরিণত হলো, অথচ তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী কারণ ও উপযুক্ত ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও ভারতীয়দের বিদ্রোহ ও বিদ্রোহী চেতনা শেষ পর্যন্ত বিপ্লবে পরিণত তো হলোই না, উল্টে প্রতি-ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে দেশ ভাগ হয়ে গেল ; রক্ত দিল, প্রাণ দিল, গৃহহারা হল লক্ষ লক্ষ লোক, কিন্তু স্বাধীনতা ও বিপ্লবের জন্য নয়, দেশ ভাগ করার জন্য। আমাদের দু'শো বছরের বিদেশীদের দ্বারা পরাধীনতার গ্লানির বিরুদ্ধে বিপ্লবের যুক্তিযুক্ততা নিশ্চয়ই রুশদেশের অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে রুশীয়দেরই বিদ্রোহের যুক্তিযুক্ততার চেয়ে দশ গুণ বেশী। তবু এমনটা হলো কেন ? আমাদের স্বাধীনতার চেতনা কম ছিল ? আমাদের দুঃখের পাত্র বঞ্চনার সঞ্চয় কিছু কম ছিল ? একেবারেই নয়। তবে ?

রাশিয়া ও ভারত—নেতৃত্বের পার্থক্য

রাশিয়া ও ভারত—এই দুই দেশের রাজনীতিতে একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য ছিল। সে হলো অভিজ্ঞতার পার্থক্য, নেতৃত্বের পার্থক্য। ১৯১৭ সালে সেখানকার জনগণ যখন আবার জাগতে সুরু করলো, তখন ১৯০৫ সালের অনেক অভিজ্ঞতা তাদের তহবিলে ছিল। তাই গ্রামে গ্রামে, সহরে বন্দরে, কলে কারখানায়, সৈন্যব্যারাকে নৌবহরে সর্বত্র রাতারাতি গড়ে উঠল সোভিয়েত বা বিপ্লবী পঞ্চায়েত—আর তাদের চোখের সামনে বিচার বিতর্ক চলতে থাকলো। বলশেভিক, মেনশেভিক, স্যোশ্যাল রেভলিউশনারী, ক্যাডেট প্রভৃতি পার্টিগুলির জাঁদরেল নেতৃত্বের তর্কাতর্কি পরিষ্কার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর। আর আমাদের দেশের জনগণের চিত্তেও একটা দীর্ঘকালীন সংগ্রামের ঐতিহ্য আছে, কিন্তু সে প্রধানত হরতাল, ধর্মঘট, আর কিছু কিছু বোমার ও বারুদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের ইতিহাস। আর যে অভিজ্ঞতাটা, বিপ্লবী সব প্রচেষ্টাকে চাপা দিয়ে, ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, তা অহিংসা সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য, ধর্মঘট ও হরতাল পর্যন্তই—বড় জোর ১৯৪২ সালে কিছু অগ্নিসংযোগ ও রেল লাইন উৎপাটন পর্যন্ত। আর আজাদ হিন্দ বাহিনীর সচেতন সশস্ত্র সংগ্রামের খবর পৌঁছেছিল মাত্র, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, সশস্ত্র সংগ্রামের কৌশল ইত্যাদির কোনো বিচারই হয়নি। আজও হয় না। আজও নেতাজী একটা ভাবাবেগের আধার মাত্র বহু জন মনে। সেটা যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের

রণ-কৌশল জাতীয় কোনো নেতৃত্ব সেকথা ক'টা লোক বিচার করেন ? আর ১৯৪৬ সালে তো তার কিছুই বোধগম্য ছিলনা—জনমনে।

চল্লিশ হাজার নাবিকের বিদ্রোহ

প্রায় ৪০,০০০ হাজার নাবিক যখন বিদ্রোহ করে বসল—হাতে তাদের এত অস্ত্রশস্ত্র যে দু' বছর পর্যন্ত লড়তে পারে, এত গুলীগোলা যখন হাতে (ক্যাসেল ব্যারাকে বিদ্রোহী নাবিকদের নির্বাচিত নেতা সিনিয়র পোর্ট ও পেটী অফিসার শেখ শাহাদত আলীর বই 'নৌ-বিদ্রোহ' দেখুন, যে বইয়ের থেকেও তথ্য নিয়েছেন উৎপল দত্ত তাঁর কল্লোল সৃষ্টিতে), তখন তাদের বিদ্রোহটা পুরোপুরি বিপ্লব তো দূরের কথা, একটা সশস্ত্র ধর্মঘটের ঊর্দ্ধে তা উঠতে পারল না। হরতাল ও ধর্মঘটের ওপরে রাস্তায় রাস্তায় কিছু মারপিট করার বাইরে ধর্মঘটী বোম্বাইয়ের লক্ষ লক্ষ মজুর ও সাধারণ জনতা বেশী কিছু করতে পারল না। অবশ্য শ' চারেক গোরা সৈনিক, শ' তিনেক নাগরিক প্রাণ দেয়। অতবড় শক্তি মাত্র তিন দিনেই অমন ভাবে পরাজিত হলো কী করে ?

কেউই নেতৃত্ব দিল না

কেউ নেতৃত্ব দিল না। কংগ্রেস নেতৃত্ব দিল না।—বিশ্বাসঘাতকতা করল। মুসলীমলীগ নেতৃত্ব দিল না—বিশ্বাস-

ঘাতকতা করল—বিপ্লবীদের এই যে অভিযোগ এবং উৎপল দত্তদের এই যে ক্রোধ, এটা এত হাস্যকর ও লজ্জাকর যে বলার নয়। বল্লভভাই ও এস, কে পাতিল বিপ্লবের নেতৃত্ব করবেন? ননসেন্স! অথচ **এই ননসেন্স** দিয়েই আমরা আমাদের নিজেদের দোষ ঢাকতে চাই। কবে গান্ধী, বল্লভভাই, নেহরু বা কংগ্রেস বলেছেন যে চরম বা পরম সঙ্কটের দিনে তাঁরাই সশস্ত্র বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবেন। এঁরা আর যাই ধোঁকা দিয়ে থাকুন দেশকে—সশস্ত্র বিপ্লব করবেন এমন ধোঁকা কোন দিনই দেননি। তবু বারে বারে ওঁদের কাছে বিপ্লবী নেতৃত্ব চাইতে যাচ্ছি কোন্ লজ্জায়?

বিপ্লববাদীদের শেষ সুযোগ

যাঁরা বিপ্লববাদী তাঁদেরই সে দায়িত্ব। এবং সে দায়িত্ব পালন করার অপূর্ব সুযোগ, সুবর্ণ সুযোগ—প্রায় শেষ সুযোগ দেখা দিয়েছিল নৌবিদ্রোহে। বিদ্রোহী নাবিকদের বল্লভভাই প্যাটেল, মুসলীমলীগের কাছে যেতে বলেছিল কে? এই লালপতাকাধারী তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টিই নয় কি? নাটকের মধ্যে, সূত্রধারের মুখ দিয়ে ও নাটক সম্বন্ধে পুস্তিকার মধ্য দিয়েকল্লোলের উদ্যোক্তারা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিই বিদ্রোহী নাবিকদের সাথে সহযোগিতা করেছিল, তাদের দাবির সমর্থনে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল, কিছু খাদ্য খাবার ও মিষ্টিজল সরবরাহ করেছিল। আর ভারতের অন্যান্য শহরেও নাবিকদের দাবিদাওয়ার উপর সভা-সমিতি করেছিল।—হ্যাঁ, করেছিল। আরও

কিছু কিছু ছোট-বড় দলও করেছিল—আর বোম্বের জনসাধারণ কারো কোনো নির্দেশের অপেক্ষা না রেখেও ধর্মঘট করেছিল, ধর্মঘট আর হরতাল করার ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা তাদের বহুদিনের —খাদ্য খাবার দিয়েছিল ঐ উপলক্ষে গোরাদের ধরে ঠেঙ্গিয়ে ছিল এবং প্রাণও দিয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো পার্টির লোক ছিল বলে এখনও পর্যন্ত কেউ দাবী করে নি।

লাল পতাকা ও বিপ্লব

কমিউনিষ্ট পার্টি বিদ্রোহী নাবিকদের অভিনন্দন করলেন, তাঁদের সমর্থনে ধর্মঘটও ডাকলেন এবং এমন ভাবে এখন কথা বলতে চাইছেন যেন বিদ্রোহটাই তাদের প্রেরণাজাত! অথচ কোথাও একটিও কমিউনিষ্ট নাবিক ছিলেন, বা নাবিক বা সৈনিকদের মধ্যে কোনো কমিউনিষ্ট কর্মী আগে থেকেই ঢুকে ছিলেন, ঠিক সময়ে বিদ্রোহের পরিচালনা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে? আর দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা যুদ্ধটাকে 'জনযুদ্ধ' বলে প্রচার করেছেন, তার পক্ষে কাজ করেছেন, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে সৈন্যবাহিনী বা নৌবাহিনীতে কোথাও ঢোকার প্রয়োজন মনে করেন নি। অথচ আশা করছেন, আনকোরা ও রাজনীতিতে অজ্ঞ ধর্মঘটী নাবিকরা বিপ্লব করে দেবেন আর তাঁদের সমর্থনে বাইরে থেকে হরতাল পালন আর লালপতাকা দেখালেই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়া হয়ে যায়।

অগষ্ট বিপ্লবীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়

বিশখানা যুদ্ধ জাহাজের ও ব্যারাকের পঞ্চাশ হাজার সশস্ত্র নাবিক চাইছে স্বাধীনতা, বিপ্লব ও তার নেতৃত্ব; আর আমরা বলছি, হুররে, এই দিচ্ছি তোমাদের রুটি, মাখন, মিষ্টিজল, আর দেখাচ্ছি—দেখছো তো কংগ্রেস ও লীগ নেতারা কিছু করল না, করবেনা? এই ভাবের ঘরে চুরি আর প্রতারণা ও আত্ম প্রতারণা দিয়ে বিপ্লব হবে? বিদ্রোহী নাবিকরা সেদিন সব পার্টির কাছে গিয়েছিল বুদ্ধি নিতে, নেতৃত্ব নিতে। তারা তো রাজনীতি জানেনা, বিদ্রোহ করতেই জানে, বিপ্লব করতে জানেনা। কমিউনিষ্ট পার্টি, কংগ্রেস, লীগ, সবারই ছুয়ারে ছুয়ারে তারা ঘুরেছিল। ১৯৪২ সালের অগষ্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব যে কংগ্রেস সোসালিষ্ট ও বামপন্থী কংগ্রেসীদের হাতে এসে গিয়েছিল সেই "অগষ্টারস্", অর্থাৎ অরুণা আসফ আলী অচ্যুৎ পটবর্ধনদের কাছেও তারা আবেদন করেছিল—তাদের নেতৃত্ব দেবার জন্য। তাঁরা ত থতমত খেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কোনো নির্দেশই দিতে পারলেন না—প্যাটেলের কাছে যেতে বলা ছাড়া। কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও দেশের নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেবার অপূর্ব সুযোগ সেদিন অরুণা আসফ আলীরা হারিয়ে ফেলেন—যা তাঁদের জীবনে আর কোনোদিন আসবেনা।

সত্যনিষ্ঠা ও বিনয় দরকার

কমিউনিষ্ট পার্টি তখনও জনযুদ্ধের ঘোর থেকে নিজেদের কাটিয়ে উঠতে পারেনি, যদিও তাদের মুখপত্র তখন "পিপলস

ওয়ার” থেকে “পিপলস্‌এজ-এ এসে গেছে। কিন্তু পিপলস্ এজে এসে পিপলস্ রিভোল্টের প্রোগ্রাম ১৯৪৮ সালের আগে তাদের দেওয়া সম্ভব হয় নি। এ ইতিহাস তো সর্বজন বিদিত, একে হোয়াইট ওয়াশ করা কি সম্ভব? বাস্তবিক ইতিহাসকে কখনও ফাঁকি দেওয়া যায় না। ইতিহাসের অলিখিত দপ্তরে সব কথা বেঁচে থাকে—অদ্ভুত তার বেঁচে থাকবার পথ। কংগ্রেস যেমন তাকে ফাঁকি দিতে পারেনি—আজ অনেক অপরাধ ধরা পড়ছে, লীগ যেমন পারেনি—তার অনেক অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা উঠেছে পাকিস্তানেও, কংগ্রেস সোসালিষ্টরা যেমন পারেনি, কমিউনিষ্টরাও পারবেনা—সব কথা উঠবে, তারই একটা নমুনা এই দক্ষিণ ও বামপন্থী কমিউনিষ্ট সংকটের মধ্যে নেই কি? অতএব অযথা আমরা যেন কেউ বেশী বীর সাজতে না চাই—একটু সত্যনিষ্ঠা ও তার জন্য কিঞ্চিৎ বিনয়ের দরকার—আত্মসমালোচনার দরকার।

সারা দেশে বিদ্রোহপ্রবণতা

সারা ভারতব্যাপী একটা প্রচণ্ড অসন্তোষ ও বিদ্রোহ-প্রবণতার মধ্যে সেদিনকার পঞ্চাশ হাজার সশস্ত্র নাবিকদের দ্বারা বিপ্লব সুরু হতে পারতো কি? তাহলে তাদের কোন্ পথ নেওয়া উচিত ছিল? এ সম্বন্ধে দু'একটা কথা হয় তো আজ বিচার করা চলে। খুব সংক্ষেপে এক-আধটা কথা বললেই আমাদের তথাকথিত বিপ্লবীপনার ফাঁকটা কোথায় চট করে ধরা

পড়ে যাবে। কি উচিত ছিল, কি সম্ভব ছিল। তার সঙ্গে কি করা হয় নি, অথচ হতে পারত, তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পঞ্চাশ হাজার বিদ্রোহী নাবিকের তাদের জাহাজে থাকা একদম উচিত হয়নি। দলে বলে এসে লক্ষ লক্ষ ধর্মঘটী বোম্বাইয়ের মজুরদের মধ্যে যোগ দেওয়া উচিত ছিল। জাহাজ দখল করে থাকা নয়, বোম্বাই দখল করাই তখন একমাত্র কাজ ছিল। এমন যে হতে পারে এই ভয়েই বোম্বের লাটসাহেব পর্যন্ত সেদিন পুণাতে পালিয়ে গিয়েছিল। এবং জেনারেল লকহার্টের ? উপর নগরীর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। মারাঠী সৈন্যেরা যখন গুলী-গোলা চালানোর হুকুম শুনলোনা, আর সর্বভারতে যখন ভারতীয় সৈন্যেরা—মায় গুর্খারা পর্যন্ত হুকুম মানতে রাজী নয়, নৌ-বিদ্রোহের দু'একদিন পূর্ব থেকেই যখন ভারতীয় বিমান বহরের সব লোকেরা ধর্মঘট করে আছে, সর্বত্র যেখানে মজুরেরা ধর্মঘট করে চলেছে, আজাদ হিন্দ বাহিনীর লোকদের মুক্তির জন্য যখন কলকাতা ফেটে পড়ছে—বোম্বাই, করাচী কলকাতার মতন প্রধান তিনটি শহর যেখানে প্রায়-বিদ্রোহী—সে অবস্থায় বোম্বাই শহর দখল করা দিয়ে সর্বভারতে বিপ্লব সুরু করে দেওয়া অত্যন্ত সহজ ছিল। অতবড় সুযোগ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহেও দেখা দেয়নি, আর অতবড় সংগ্রামের পরিধি ১৯২১, ১৯৩০-৩২, ১৯৪২ সালের সংগ্রামগুলিকে অনায়াসে ম্লান করে দিতো, এমন কি আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগ্রামটার ভবিষ্যৎও তার তুলনায় কিছু নয়—হয়ে যেতো।

যদি বিপ্লবী নেতৃত্ব থাকতো

জলের মধ্যে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ জাহাজে অবস্থান করা মানে নিজেদের হাত-পা বেঁধে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা। জাহাজে না আছে খাদ্য না আছে যথেষ্ট মিষ্টি জল। আর বৃটিশ নৌবহরের বৃহৎ দূরপাল্লার কামান আর রয়েল এয়ারফোর্সের বমবারি থেকে কতদিন তারা আত্মরক্ষা করতে পারে ? ভারতীয় বিপ্লব তো ২০ খানা ফ্রিগেটের মধ্যে নেই, আছে ভারতের বিশাল ভূমিখণ্ডে—তার চল্লিশ কোটি জনগণের মধ্যে। সেখানে না এসে, তাদেরকে সংগঠিত না করে গুটি কয়েক পম পম গান, অবলিকান গান, আর চার ইঞ্চি ব্যাসের কামানের সাহায্যে জলেই বিপ্লব হবে কী করে ? সে দিন দেশে যদি কোথাও কোনো প্রতিষ্ঠাবান বিপ্লবী নেতৃত্ব থাকতো, তবে সেই নেতৃত্ব নাবিকদের দৃঢ়ভাবে হুকুম দিতেন—"তোমরা এক্ষুনি জল থেকে নেবে এস, বোম্বাই দখল করো, জনগণকে সংগঠিত করো, তাদেরকে সশস্ত্র হতে সাহায্য করো, দেশকে ডাক দাও 'আবার দিল্লী চলো' ইত্যাদি।" এর নাম বিপ্লবী নেতৃত্ব। এখন তুলনা করে দেখুন—আমরা যত সব বিপ্লবী দল ছিলুম তখন, কী বলেছিলুম এবং কতটুকু ভাবতে পেরেছিলুম !! আর বেশী কথা বলে লাভ কি ?

পথ কোথায় ?

কিন্তু সমগ্র বিদ্রোহীদের মধ্যে কারো মাথাতেই সে চেতনা এলোনা কেন ? 'পথ কোথায়, কি করি' বলে যখন তারা হয়রান,

হাতের কাছেই অমন সহজ পথটা ধরা পড়ছে না কেন ? শাহাদত আলী তাঁর বইতে একস্থানে লিখেছেন যে তাদের বোধ হয় গেরিলা যুদ্ধ করতে হবে। তিনি সামরিক অফিসার হয়েও বলছেন গেরিলা যুদ্ধ ! গেরিলা যুদ্ধ কি জলে হয় ? না, বোম্বাই শহরে হয় ? গোটা বোম্বাই শহর যখন তাদের অনুসরণ করতে প্রস্তুত, তখন ওখানে আবার গেরিলা যুদ্ধ কি ? গেরিলা যুদ্ধ যদি করতেই হয় সে হবে গ্রামে গ্রামে, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে। তারও দরকার হতে পারে হয় তো, কিন্তু বোম্বাই, করাচী, কলকাতা যদি দখল হয়ে যায়, তবে গেরিলা যুদ্ধেরও অত দরকার হতো না—যা চীনারা বিশ বছর ধরে লড়েছিল। সে সংগ্রাম হয় তো অনেকটা রুশ ঢং-এই চলে যেতো, যদিও সে জাতীয় প্রোগ্রাম রণদিভের নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালে নাকি তাঁরা ভেবেছিলেন—অর্থাৎ শহর থেকে বিপ্লব সুরুর প্রোগ্রাম—যদিও বাস্তব পরিস্থিতি তখন শহর থেকে বিপ্লবকে হটিয়ে দিয়েছে, আশ্রয় নিয়েছে তেলেঙ্গানার গ্রামে গ্রামে। আবার তেলেঙ্গানার গ্রামে জঙ্গলে লড়াই করছে যখন—তখন ভাবতে পারছে না চীনের মত গেরিলা রেড আর্মি গঠন করার প্রয়োজনের কথা—তখন মশগুল অক্টোবর বিপ্লবের পুনরভিনয় করার স্বপ্নে !

বিপ্লব আর বিপ্লবী আন্দোলনের চেহারা

"বিপ্লব" বলে একটা শব্দ আমাদের দেশে খুবই ব্যবহার হয়, অথচ বিপ্লবের বিজ্ঞান নিয়ে তেমন কোনো চিন্তা-চেতনা

কোনো কালেই হয় নি। বিপ্লবী অনেক হয়েছেন, অনেকে অদ্ভুত সাহস দেখিয়ে প্রাণ দিয়ে গেছেন, কিন্তু বিপ্লব শাস্ত্রটির কখনও গবেষণা করা হোতো না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা ইতিহাসই দিই। বিখ্যাত বিপ্লবী সূর্য সেনের কথাই ধরা যাক্। বিপ্লবী আন্দোলনের শেষ ও চরম নিদর্শন বলে যা অনেকেই বলে থাকেন। একদিন রাত্রিতে হঠাৎ চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার ও অন্যান্য ঘাঁটি আক্রমণ করে বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম শহর দখল করে বসলেন। কিন্তু তার পর কী হবে, তা ভাবেন নি। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অস্ত্রেরই জন্য—যদি হয়, তবে দখল করার পর যখন দেখা গেল সাতশো রাইফেল (মাস্কেট) বহু গুলী-বারুদ সহ মজুত আছে, তখন ঐ ডজন দুই বিপ্লবী সৈনিকরা প্রত্যেকে দুটো করে রাইফেল নেবার পর বাকীগুলি দিয়ে কী হবে, ভেবে না পেয়ে পেট্রল দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিলেন! যে গাড়ীটা গিয়েছিল তাতে পেট্রল লাগাতে গিয়ে দগ্ধ ছেলেটিকে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে অনন্ত সিং চলে গেলেন! মানে, অস্ত্র ব্যবহার করার মত কোনো প্ল্যানই ছিল না! আর যে ৩০/৪০ টা রাইফেল বিপ্লবীরা নিয়ে গেলেন, তার ব্যবহার একবারই মাত্র হলো—জালালাবাদ পাহাড়ে, যেখানে তা দিয়ে সাক্ষাৎ সংগ্রামের পর অনেকেই মারা গেলেন, বাকীরা সরে পড়লেন, রাইফেল ওখানে পড়ে রইল। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা আর কোথাও রাইফেল ব্যবহার করার সুযোগ পান নি —হাতবোমা ও পিস্তল—যা তাঁদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পূর্বেও ছিল তাই দিয়েই লড়তে হয়। তার মানে, অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কোনো

সুবিধাই নেওয়া সম্ভব হলো না। এভাবে জয়টাও পরাজয়ে দাঁড়িয়ে যাবার কারণ পূর্বে থেকে পরিকল্পনার অভাব ছাড়া আর কি হতে পারে?

কতকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দখলীকৃত শহরটা ছেড়ে দিয়ে তাঁরা অজানা একটা পাহাড়ে উঠে বসলেন এবং ভাবতে শুরু করলেন, এখন কী করা যায়! সেখানে না আছে খাদ্য, না আছে কোথাও সরে যাবার পথ। এদিকে ব্রিটিশ সরকারও ভয়ে ভয়ে ঢুকছে শহরে—কি জানি, কোথায় বিপ্লবীরা ওৎ পেতে আছে। এসে দেখে শহরে কেউ নেই, গেল কোথায়? একটু খুঁজতেই বুঝে নিল, নিকটবর্তী পাহাড়েই আছে। জালালাবাদ পাহাড়ের চেয়েও উঁচু একটা টিলায় মেশিনগান বসিয়ে বৃষ্টির ধারায় গুলি চালিয়ে বিপ্লবীদের রক্তস্নাত করে দিল, মাস্কেটের গুলীর প্রত্যুত্তর শিক্ষিত গুর্খাদের কাছেও পৌঁছতে পারল না। রাত্রির অন্ধকারে মৃত শহীদদের ফেলে দিয়ে বাকীরা অন্যত্র সরে পড়লেন। তার পরও তিন বছর ধরে সূর্য সেন মাঝে মাঝে সন্ত্রাসবাদী আঘাত কিছু কিছু হানতে লাগলেন। কিন্তু সে কতদিন? তারপর একদিন এই বীর ধরা পড়লেন এবং জীবন দিলেন ফাঁসীকাঠে। কিন্তু সেদিন কি তাঁদের পক্ষে এর চেয়ে বেশী কিছু করার ছিল না? সেদিন কি সেই ১৯৩০-৩২ সালের ভারতব্যাপী গণ-সংগ্রামের দিনে উপযুক্ত সমর্থনের বিশাল ক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল না? কেন সে বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়লো না, এত সমর্থন চারিদিকে থাকা সত্ত্বেও? কেন পার্শ্ববর্তী পাহাড়-পর্বত ও পার্বত্য

উপজাতিদের মধ্যে সে সংগ্রাম গেরিলা যুদ্ধে দীর্ঘায়ত করে নেওয়া হলো না? আরাকান ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপারেই যে তখন ব্রহ্মে সায়াসেনদের বিদ্রোহ চলেছে একই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে, তাদের সঙ্গেই বা চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের সহযোগ হলো না কেন?

বিপ্লবী যুগে এভাবে অনেক বিপ্লবী প্রাণ দিয়েছেন, তা দেবার দরকারও ছিল, কিন্তু তা-ই সব নয়। তার মধ্য দিয়ে সার্থক বিপ্লবের পথ যদি তৈরী করতে না পারা যায়—যা পারা যায় নি—তবে বিপ্লবের পথেও জনগণ আসতে পারে না। এভাবে ভারতে বিপ্লবী সংগ্রামের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। আর সেপথে কেউ হাঁটতে চায় না।

গণ বিপ্লবের যুগে

এর পরের যুগে গণ বিপ্লবের নাম করে যাঁরা নতুন ধরণের বিপ্লবের কথা বলেছেন, তাঁদের কার্য-কলাপও নৌবিদ্রোহের সময় ধরা পড়ে যায়। নৌবিদ্রোহ যত না কংগ্রেস ও লীগকে expose করেছে, তার চেয়ে ঢের বেশী expose করেছিল কমিউনিষ্ট, সোশালিষ্ট, অগাষ্টার—এঁদের। আর প্রথম থেকেই ভারতে যদি একটা সত্যিকার বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনা-গবেষণা থাকতো, বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে, তবে সাধারণভাবে সে সব ভাবধারা সাধারণ মজুর, চাষী, নাবিক, সৈনিক—এদের মধ্যেও

ছড়িয়ে যেতো। তখন তারা নিজেরাও, "কি করিতে হইবে" তার পক্ষে হাতের কাছেই অভিজ্ঞতাজাত অনেক মত পথ ও বুদ্ধি কৌশলাদি পেয়ে যেতো, যা রুশ দেশে শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও নাবিকদের অভাব হয় নি।

স্বাধীন ভারত সরকারের অনীহা

আজ যাঁরা সেদিনকার সেই ঘটনাবলীর যথাযথ বিশ্লেষণ করতে চান তবে হারিয়ে যাওয়া সে সব তথ্যাবলীকে প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো অন্বেষণ করে তাদের সবটা সাজিয়ে তুলতে হবে—পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করতে হবে—স্থান ও কালের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। ভারত সরকার শ্রীটেকচাঁদের সভাপতিত্বে একটি অনুসন্ধান কমিটিও বসিয়েছিলেন—এই কমিটিতে শ্রীটেকচাঁদ ছাড়াও, কুনুয়ার তুলিন সিং, মিঃ জয়াকার, বিচারপতি জাফরুল্লাহ, কে, বেঙ্কটেরাম শাস্ত্রী ও বিচারপতি বিশ্বাস ও সার আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার সদস্য হিসাবে ছিলেন। কিন্তু প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার সেই রিপোর্টটি কখনো পাবলিক ডকুমেণ্ট হিসাবে উপস্থিত করেন নি—স্বাধীন সরকারও সে রিপোর্টটি নিষিদ্ধ বস্তু করে রেখেছেন। কেন রেখেছেন, এ প্রশ্ন আজ ওঠা উচিত। শ্রীবলাই দত্ত বলেন সেই রিপোর্ট যাতে জনসমক্ষে উপস্থিত করা হয় তার জন্য চাপ সৃষ্টি করার স্বার্থেই তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই

লেখাটি প্রকাশিত করেছেন। আমরা সেই রিপোর্ট চেয়েও সংগ্রহ করতে পারিনি—কোন একদিন হয়তো তা প্রকাশিত হবে। তার পূর্বে আমরা যতটুকু সম্ভব তৎকালীন সংবাদ সংবাদপত্র থেকে যথাযথ অনুবাদ করে এই পরিশিষ্ট রচনা করে দিলাম। মনে হয় এতে অনুসন্ধিৎসা বাড়বে, এবং উৎসাহী গবেষকদের সাহায্য করবে। মাত্র কয়েকটি দিনের ঘটনা—এই নৌবিদ্রোহ মাত্র চার দিনের ঘটনা, কিন্তু দুশত বছরের পরাধীনতার ইতিহাসের অন্ধকার রাজ্যে সহসা বিদ্যুৎ-এর ঝলসান-আলোকে অনেক তথ্য সেদিনকার সেই অবোধ বিদ্রোহটি দেশবাসীর দৃষ্টিতে এনে দেয়। আবার তেমনি তাড়াতেই সেই দৃশ্যকে আবার ঢেকে দেওয়া হয়। রাজনৈতিক দল ও নেতারাই সেই দৃশ্যকে আবার ঢেকে দিতে ব্যস্ত হন—কেন ব্যস্ত হন—কী তাঁদের বক্তব্য ও দুর্বলতা ছিল ?

আত্মসমালোচনার অভাব

আজ আবার কোন কোন মহলে নৌ-বিদ্রোহের প্রায়-লুপ্ত স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা দেখা যায়—যদিও সংশ্লিষ্ট মহলের রাজনৈতিক স্বার্থের খাতিরে। অথচ নৌবিদ্রোহের প্রকৃত তাৎপর্য ও শিক্ষা গ্রহণে প্রচুর দ্বিধা লক্ষ্য করা যায়—সত্যনিষ্ঠা জাত আত্মসমালোচনার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

পরিশেষে যে প্রশ্নটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে যুগে যুগে

মাথা তুলবে সেটি হলো স্বাধীনতার নাম করে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষকে খণ্ডিত না করে স্বাধীন করার কোন উপায় ছিল কিনা। প্রশ্নটি সংক্ষিপ্তভাবে বলাইবাবুও রেখেছেন। ঐতিহাসিকেরা যা ঘটে তার বর্ণনা দিয়েই খালাস, যা ঘটতে পারতো, অন্যরকম কিছু ঘটতে পারতো কিনা সে জাতীয় গবেষণার মধ্যে যান না। সে কাজ রাজনীতিবিদদের। স্বাধীনতা পেয়েই যে সব ভারতীয় ও পাকিস্তানী নেতারা আত্মসন্তোষে বিভোর হয়ে ছিলেন তাঁদের পক্ষে ভারত-বিভাগকে একটা অনিবার্য বিকল্পহীন ঘটনা বলেই সাফাই করার চেষ্টা ছিল এবং আজও থাকবে। তাঁদের apologist হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু যাঁরা বিপ্লববাদী বলে নিজেদের জাহির করতে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁদের একথা স্বীকার করতে হবে যে ভারতবর্ষের অখণ্ডতা রক্ষা করে সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শেষ সুযোগটা বোধ হয় নৌবিদ্রোহকে অস্বীকার করেই হারিয়ে যায়। সর্বভারতীয় অসাম্প্রদায়িক বিপ্লবের শেষ পদধ্বনি ঐ নৌবিদ্রোহের মধ্যেই শোনা গিয়েছিল, সে বিদ্রোহের প্রকৃত তাৎপর্য, বাণী ও আদেশ সেদিনকার কি বাম কি দক্ষিণ কোন দলই অনুভব করতে পারেন নি—এমন কি অরুণা আসফ-আলীরাও। ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর অথচ সত্যনিষ্ঠ বিচারের রায় থেকে কারো নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই। সে বিদ্রোহ ও বিপ্লব ব্যর্থ ও পরাস্ত করার দায়িত্ব কেবল কংগ্রেস নেতৃত্বেরই নয়—কংগ্রেসবিরোধী তথাকথিত বিপ্লবীদের দায়িত্ব ও অংশও কম নয়।

নৌবিদ্রোহ সম্বন্ধে মহাত্মাজী

২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ সালে মহাত্মা গান্ধী পুণার নেচার-কিওর হাসপাতাল থেকে যে বিবৃতি দেন সেটি খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। দুটি জিনিষ এর ভিতর প্রকাশ পায় (১) নৌ-বিদ্রোহ সম্বন্ধে মহাত্মাজীর ধারণা, (২) ১৯৪২ সালে আগষ্ট বিদ্রোহের সময় কংগ্রেসের মধ্যেই যে নবীন নেতৃত্বের সূত্রপাত হয়—অরুণা আসফ-আলী, জয় প্রকাশ নারায়ণ, ডঃ রাম মনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পটবর্ধন, অশোক মেহতা—এঁরা যার প্রবক্তা রূপে প্রতিভাত হয়ে আসছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কংগ্রেস হাই কমাণ্ড ও গান্ধী-নেতৃত্বের পার্থক্য কোথায় সে সম্বন্ধেও গান্ধীর বিচারের কিছু ইঙ্গিত এ বিবৃতিতে আছে। বলা বাহুল্য, এঁদের মধ্যে সেই সময়ে বিদ্রোহী নেতা হিসাবে সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন অরুণা আসফ আলী। নৌবিদ্রোহীরা তাই অনেকটা বেশী আশা করেছিলেন অরুণা আসফ আলী নেতৃত্বের কাছ থেকে। যাই হোক মহাত্মা গান্ধী এ বিবৃতির মধ্যে অরুণা আসফ-আলীকে জবাব দিতে গিয়ে তৎকালীন বিদ্রোহী বিকল্প নেতৃত্ব সম্বন্ধেই পরোক্ষভাবে তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করেন। সম্পূর্ণ বিবৃতিটি এই :—

"সম্প্রতি বম্বের ঘটনার উপরে আমার বিবৃতির বিরোধিতা করে শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী যে বিবৃতি দিয়েছেন তার জন্য

তাঁকে ধন্যবাদ। নিজের ঔরসজাত না হলেও, আমি তাঁকে আমার কন্যা বলে মনে করি যদিও সে কন্যা বিদ্রোহী। সাধারণ অবস্থায় তাঁর প্রতিবাদে আমি কোন প্রতিবাদই করতাম না। কিন্তু তিনি নিজেকে ছাড়াও, যেহেতু আত্মগোপনকারী সংগ্রামীদের প্রতিনিধি স্থানীয়া, সেহেতু আমাকে প্রকাশ্যে এই বিবৃতি দিতে হল।

'সত্যিকার বিপ্লব'

তাঁর আত্মগোপনকারী অবস্থায় কয়েকবারই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল, আমি তাঁর সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও জ্বলন্ত দেশপ্রেমের প্রশংসা করি, কিন্তু প্রশংসা সে পর্যন্তই। তাঁর আত্মগোপনকারী জীবন আমি পছন্দ করি না। আত্মগোপনকারী কার্যকলাপও আমি পছন্দ করি না।

"আমি জানি, লক্ষ লক্ষ লোক আত্মগোপন করতে পারে না। লক্ষ কোটি লোকের আত্মগোপনের প্রয়োজনও হয় না। কিছু কিছু লোক আত্মগোপন করে গোপন নির্দেশের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ লোককে তাদের স্বরাজ আনয়ন করে দিতে পারেন এমন ধরণের আনন্দ পেতে পারেন। কিন্তু একি ঝিনুক দিয়ে খাওয়াবার মত নয়? খোলা চ্যালেঞ্জ, প্রকাশ্য কার্যকলাপই সকলে অনুসরণ করতে পারে। সত্যিকার স্বরাজ—সকলকেই অনুভব করতে হবে—

পুরুষ, নারী ও শিশু—সকলকে। সে জাতীয় সার্থকতার জন্য পরিশ্রম করাই হল সত্যিকার বিপ্লব।

পৃথিবীর সকল নির্যাতিত জাতিদের সামনে ভারতবর্ষ একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থিত। কেননা, এই ভারতবর্ষেই দেখা দিয়েছে এক উন্মুক্ত অস্ত্রহীন, অহিংস ব্যাপক প্রচেষ্টা যা সকলের কাছেই আত্মদান দাবী করে, অথচ, যারা ক্ষমতাশীল তাদের অনিষ্টকর এমন কিছু দাবী করে না। ভারতের লক্ষকোটী লোকের আজ এমন ধরণের জাগরণ হতো না যদি না এই ধরণের উন্মুক্ত অস্ত্রহীন সংগ্রাম প্রচলন করা যেত। এই পথে যেখানেই এবং যখনই বিচ্যুতি ঘটেছে তখনই এই ক্রমবিকাশী বিপ্লবের (Evolutionary Revolution) গতি সাময়িকভাবে রুদ্ধ হয়েছে।

'৪২' এর কার্যকলাপ

"১৯৪২ সালের ঘটনাবলীর পাঠ এ বীরাঙ্গণা মহিলা যে ভাবে নেন আমি সেভাবে নিইনা। স্বতস্ফূর্ত্তভাবে জনসাধারণ সে আন্দোলনে অভ্যুত্থান করেছিল এ সংবাদ শুভ সন্দেহ নাই। কিন্তু কেহ কেহ অথবা অনেকেই হিংসার পথ নিয়েছিল এটা ভাল সংবাদ নয়। শ্রীকিশোরীলাল মসরুওয়ালা, কাকাসাহেব এবং আরও কেহ কেহ সাময়িক অধৈর্য উৎসাহে অহিংসার ভুল ব্যাখ্যা করেছিলেন তাতেও কোন ভিন্ন যুক্তি সৃষ্টি করেনা। তাঁরা যে এধরণের ভুল ব্যাখ্যায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাতে একথাই

প্রমাণ হয় যে অহিংসা একটি অত্যন্ত লাজুক বা Delicate হাতিয়ার। কারও উপরে কোন অপ্রীতিকর মন্তব্য করার উদ্দেশ্যে আমি এই উপমাটি দিইনি—যে যা ভাল বুঝেছেন সে অনুযায়ী কাজ করেছেন। সংঘবদ্ধ হিংসার তাণ্ডবমূর্তির সামনে মাথানত করে চলা কাপুরুষতারই নামান্তর। আবার ১৯৪২ সালের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমার বিচার ও বিশ্লেষণ প্রকাশে দ্বিধা করাও দুর্বলতা ও অন্যায়।

'দূরদৃষ্টির অভাব'

"অরুণা হিন্দু ও মুসলমানকে নিয়মতান্ত্রিক মোর্চায় মিলিত করার চেয়ে লড়াই এর ব্যারিকেডে মিলিত করার পক্ষপাতি। সহিংস সংগ্রামের শাস্ত্রেও এ ধরণের চিন্তা ভুল। ব্যারিকেডে হিন্দু-মুসলমানের এই মিলন সত্যনিষ্ঠ হলেও নিয়মতান্ত্রিক বা Constitutional মোর্চায়ও এ মিলনের প্রয়োজন আছে। সংগ্রামী সৈনিকেরা সব সময়ই ব্যারিকেডে বাস করে না। তারা নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করেনা। ব্যারিকেড জীবনের পরে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক মোর্চায়ও উপস্থিত হতে হয় এই মোর্চাটিও তাঁদের পক্ষে নিষিদ্ধবস্তু নয়।

"বৃটিশের বর্তমান ঘোষণাগুলিকে অবিশ্বাস করা এবং আগে থেকেই ঝগড়া সৃষ্টি করা মোটেই দূরদৃষ্টির পরিচায়ক নয়। তাঁদের তরফ থেকে যে সরকারী ডেপুটেশন আসছে, তা কি ভারতের মত

একটি বৃহৎ দেশকে প্রতারিত করার জন্য—এইরূপ চিন্তা বীরোচিত ও বীরাঙ্গনাচিত নয়।

"একটু অপেক্ষা করলে কি ক্ষতি হত; যে সরকারী প্রতিনিধিদল আসছেন তাতে বৃটিশ ঘোষণার উপর বিশ্বাসযোগ্য কিছু তাঁরা দিতে পাচ্ছেন না সেটা শেষ বারের মত প্রমাণিতই হোক না। আমাদের দেশ ওদেরকে বিশ্বাস করে লাভবান হবে। প্রতারিতের নির্ভুল সারাতে শেষপর্যন্ত প্রতারকই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

"ঘটনার মুখোমুখি হইনা কেন? যে মিশনটি আসছেন তাঁরা নিজেদের ভারতের বন্ধু বলেই ঘোষণা করেছেন, ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারটি তাঁরা নিয়মতান্ত্রিক পথেই বের করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন। সমস্যাটি সত্যিই জটিল, হয়ত যে কোন রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌দের পক্ষে জটিলতম। এমনও হতে পারে মিশন হয় তো এসে এই জটিল সমস্যাটিকে একটি সমাধানহীন ধাঁধাঁতে দাঁড় করিয়ে দেবেন। তাতে তাঁদের পক্ষে ক্ষতিই হবে। যদি তাঁদের উদ্দেশ্য সৎ হয়ে থাকে এবং তাঁদেরই তৈরী সমস্যাজাল থেকে তাঁরা নিজেরা মুক্ত হতে চান তবে সে পথ মিলবে বলে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু আমাদের দেশকেও তো এই খেলাতে ন্যায্য অংশ নিতে হবে। যদি তা করে তবে তাঁকে কোনকালের জন্য হলেও ব্যারিকেড ফেলে আসতে হবে। আমি অরুণা ও তাঁর বন্ধুদের কাছে আবেদন করি তাঁরা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও আত্মদানের ভিতর দিয়ে যে শক্তি সঞ্চয় করেছেন তা যেন বিজ্ঞজনোচিতভাবে ব্যবহার করেন।

'কে কাকে হতাশ করল'

"সর্দার প্যাটেলের উপদেশ মত রেটিংরা যে আত্মসমর্পণ করেছেন এ একটি বড় স্বস্তির খবর। এর দ্বারা তাঁরা তাঁদের আত্মসম্মান বিসর্জন করেন নি। যতদূর আমি দেখতে পাই বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হওয়ার উপদেশটি কখনই সদুপদেশ হয়নি। যদি কল্পিত অথবা সত্য নালিশের প্রতিবাদে সে বিদ্রোহ ঘটে থাকে, তার পূর্বে তাঁদেরই পছন্দমত রাজনৈতিক নেতাদের পরামর্শ ও হস্তক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল।

"যদি তাঁরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে বিদ্রোহ করে থাকেন তবে তাঁদের ভুলটাও আরও বেশী বা দ্বিগুণ। একটি সুসংগঠিত বৈপ্লবিক দলের নেতৃত্ব ও ডাক ছাড়া তাঁদের তা করা উচিত হয় নি। যদি তাঁরা মনে করে থাকেন যে একমাত্র তাঁদের শক্তির জোরেই তাঁরা ভারতবর্ষকে বৈদেশিক পরাধীনতা থেকে মুক্ত করে দিতে পারবেন তবে তাতে তাঁদের চিন্তাহীনতা ও অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়।

'আত্মঘাতী'

"অরুণা ঠিকই বলেছেন যে এই সংগ্রামী নাবিকেরা যে সাহস ও দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, তা অভূতপূর্ব। কিন্তু এ সাহস নির্বোধ দুঃসাহসে পরিণত হয় যদি তা সময়োচিত না হয় এবং এর পরিণাম আত্মঘাতী হয়ে থাকে।

"অরুণা দাবী করতে পারেন যে, জনসাধারণ হিংসা ও অহিংসার তাত্ত্বিক যুক্তিযুক্ততায় আগ্রহী নয়, কিন্তু আমি বলি মুক্তির পথ হিংসা অথবা অহিংসার পথে আছে কিনা সে প্রশ্ন জনসাধারণের আছে। জনসাধারণ অবশ্য এযাবৎ অহিংসার পথেই অগ্রসর হয়েছে যদিও অসম্পূর্ণভাবে আংশিক বিচ্যুতির মধ্য দিয়ে। অরুণা ও তাঁর সহকর্মিরা নিজেদের বারে বারে প্রশ্ন করে দেখতে পারেন, যুগ যুগান্তের নিদ্রা থেকে ভারতবর্ষকে জাগরণের পথে আনতে, অস্পষ্ট হলেও স্বরাজের জন্য একটি ব্যাপকতম আকাঙ্খা সকলের মনে ধীরে ধীরে সৃষ্টি করতে অহিংসার পথ তাঁদের কতটা কি করেছে। আমার মতে সেখানে প্রশ্নের উত্তর মিলবে।"

এ পথ স্বরাজের নয়—গান্ধীজী

পুণা থেকে মহাত্মা গান্ধী ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ সালে এক বিবৃতিতে বলেন :

"অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘটনাবলী অমি লক্ষ্য করে যাচ্ছি নৌবাহিনীতে বর্তমানে এই যে বিদ্রোহ চলেছে এবং তাকে অনুসরণ করে অন্যত্র যে সব ঘটনা ঘটছে, তাকে কোনমতেই অহিংস বলা যায় না। যখনই কাউকে জোর করে 'জয় হিন্দ' বলান হয়, অথবা অন্য যে কোন জনপ্রিয় শ্লোগান বলতে বাধ্য করা হয়, লক্ষকোটি জনসাধারণের স্বরাজ বলতে যা বোঝায় তার কবর

সৃষ্টি করার পক্ষে সেগুলি সবই মর্মান্তিক আঘাত হয়ে উঠে। গীর্জা ধ্বংস করা অথবা ঐ জাতীয় কোন কাজই কংগ্রেস সমর্থিত স্বরাজের পথ নয়। ট্রামকার জ্বালান, সম্পত্তি ধ্বংস করা, ইউরোপীয়দের অপমানিত অথবা আহত করা, আমার সমর্থিত অহিংসা তো দূরের কথা কংগ্রেস সমর্থিত অহিংসাও সেটা নয়। এই সংগ্রামের সকল পরিচিত ও অপরিচিত নেতাদের কাছে এই বিবেচনাহীন হিংসার উন্মাদনার পরিণাম সম্বন্ধে আমি ভাবতে অনুরোধ করি এবং এই পথ থেকে বিরত হতে বলি। পৃথিবীর লোকেরা যেন একথা না বোঝেন যে কংগ্রেসের ভারতবর্ষ মুখে অহিংসার পথে স্বরাজ সাধনার কথা বলে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিশেষ করে চরম পরীক্ষার সময়ে তারা অন্য পথ নেয়। আমি ইচ্ছা করে বিবেচনাহীন কথাটি ব্যবহার করেছি। কেননা বিচার ও বিবেচনা সম্মত সহিংস পথও একটা আছে।

"আমি আজ যে সহিংস কার্যকলাপ দেখছি তা সত্যিই বিচার বিবেচনাহীন। যদি নৌবাহিনীর সৈনিকেরা অহিংসার তাৎপর্য বোঝেন তো অহিংস প্রতিরোধের পথ গৌরবময়, পুরুষোচিত ও সমবেত ভাবে প্রয়োগ করলে সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হতে পারে। ব্যক্তির পক্ষে এ পথ সবসময়ই প্রযোজ্য। যদি কারও মনে হয় যে চাকরীর অবস্থা ও ব্যবস্থা কারও পক্ষে অথবা ভারতবর্ষের পক্ষে অপমানজনক তবে তিনি সে কাজে ইস্তফা দেবেন না কেন? এজাতীয় কর্মপন্থাকে আমি নাম দিয়েছি অহিংস অসহযোগিতা। কিন্তু নাবিকেরা তাঁদের কাজের বর্তমান বিদ্রোহাত্মক কাজের দ্বারা

ভারতের পক্ষে একটি খারাপ ও অযোগ্য দৃষ্টান্ত বা ঐতিহ্য সৃষ্টি করছেন।

"হিন্দু ও মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসামূলক কার্যকলাপের জন্য এই যে 'মিলন' তা অশুভ এবং হয় তো ঐ পথের ভবিষ্যত নিজেদের মধ্যে হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য প্রস্তুতি বলে পরিণতি লাভ করতে পারে—দেশ এবং পৃথিবীর পক্ষে যা হবে খুবই ক্ষতিকারক।

"ইংরেজ শাসকেরা ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন বলে ঘোষণা করেছেন, জনসাধারণের হৃদয়ে লুক্কায়িত তিক্ত অসন্তোষের বিক্ষুব্ধ প্রকাশ যেন সেই ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্ত্তটিকে কোন কারণে বিলম্বিত না করে। এ বিক্ষোভের শক্তি সীমাহীন সন্দেহ নাই, কিন্তু এর ব্যবহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে দেওয়া ঠিক নয়। এমন কি তা দুষ্টবুদ্ধিজাত হয়েও যেতে পারে, যদি দেশকে অথবা তার একটি বৃহৎ অংশকে আবার দাবিয়ে দেওয়ার পক্ষে একটা অছিলা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কারণ এই দেশ বা জনসাধারণ আজ বহুদিন পরপদানত।"

অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য নেহরুর কাছে তার

শ্রীমতী অরুণা আশফ আলী নৌ-ধর্মঘটের বিস্ফোরক পরিণতির মুখে বম্বে থেকে দিল্লীতে পণ্ডিত নেহরুর কাছে নিম্নোক্ত

জরুরী তারবার্তা পাঠান,—"নৌধর্মঘট চরম উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে, অবস্থা ভয়ানক পরিণামের দিকে, চুড়ান্ত হেস্তনেস্তের দিকে অগ্রসর, একমাত্র আপনিই অবস্থা আয়ত্তে আনতে পারেন এবং আসন্ন ট্র্যাজেডি থেকে রক্ষা করতে পারেন ; এই মুহূর্তে আপনার বম্বেতে উপস্থিতির জন্য একান্তভাবে অনুরোধ করি।"

নেহরুর ভূমিকা—জনসমাবেশে

"India today is a volcano of 400 million human beings, who refused to be ignored in the world—Pt. Nehru at Chowpatty meeting."

২৬ তারিখে পণ্ডিত নেহরু বোম্বাই আসেন, চৌপট্টিতে প্রায় দু'লক্ষ লোকের জনসমাবেশে পণ্ডিত নেহরু একই সঙ্গে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ও তার নির্মম শাসনের বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ করেন ও অপরদিকে ধর্মঘটী নাবিকদেরও নানা ধরণের ধমক দেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বরাবরই বম্বেতে ছিলেন, তিনি প্রথম থেকেই সব ব্যাপার জানতেন, বিদ্রোহী নাবিকেরা বিভিন্ন সূত্রে তাঁর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার চেষ্টাও করেন, সর্দার প্যাটেল বরাবরই এই ধর্মঘটের বিরুদ্ধে ছিলেন। নাবিকদের বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের উপদেশ তিনি বরাবরই দিয়েছেন, বিদ্রোহী নাবিকদের পক্ষে বোম্বাই সহরের শ্রমিক ও জনসাধারণের হরতাল

বিক্ষোভাদি ব্যাপার তিনি নিঃসঙ্কোচে নিন্দা করেছেন, অর্থাৎ তাঁর মধ্যে কোন কিন্তু বা দ্বিধা ছিল না। পণ্ডিত নেহরু একই সঙ্গে ঠাণ্ডা ও গরম বাণীর প্রবাহ ছাড়তে অভিজ্ঞ ছিলেন। পণ্ডিত নেহরু ১৯৪২ সালের আন্দোলনকে অস্বীকার করেন নি—নিন্দাবাদও করেন নি, যদিও স্বয়ং গান্ধীজী ১৯৪২ সালের দায়িত্ব অস্বীকার করেন। এই সব কারণে পণ্ডিত নেহরু সেদিনকার ভারতে সবচেয়ে বীর বলে বন্দিত ছিলেন। তা ছাড়া আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সেনাপতিদের ডিফেন্সের জন্য পণ্ডিতজীর ব্যারিষ্টারের পোষাক পরে কোর্টে উপস্থিতি ইত্যাদি কার্যকলাপও অতীতে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর যে বিরোধিতা ছিল সেই তিক্ত ইতিহাসটুকু পণ্ডিত নেহেরুর অনুকূলে ও মহিমায় মুছে যায়। অতএব ইতিহাসের সেই চরম বৈপ্লবিক মূহুর্তে পণ্ডিত নেহরুর ভূমিকা কি ছিল সে কথার পুনর্বিচার একদিন ঐতিহাসিকেরা করবেনই করবেন। আমরা ঐদিন চৌপাট্টি সমুদ্রসৈকতে তিনি যে ভাষণ দেন তাঁর কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে রাখি। ঐ সভায় বল্লভভাই প্যাটেলও উপস্থিত ছিলেন এবং ভাষণও দিয়েছিলেন—অবশ্য তাঁর নিজের স্বভাবসিদ্ধ রক্ষণশীল সুরে। সর্দার প্যাটেল সে সময় খুব জনপ্রিয় নেতা ছিলেন না, সেজন্যেই বম্বের সেই উত্তেজিত মূহুর্তে নিজে থেকে তিনি কোন সভা ডাকেন নি। বম্বের বীর বিপ্লবী জনতাকে শান্ত করার মত কোন ক্ষমতাই তাঁর ছিল না। পণ্ডিত নেহরুরও বোধ হয় ছিল না। পণ্ডিত নেহরু যখন বম্বেতে আসেন নৌবিদ্রোহের

তখন অবসান হয়ে গিয়েছে, বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করেছেন, জনসাধারণ স্তব্ধ অথচ বিক্ষুব্ধ। পণ্ডিত নেহরুর সেদিনকার ভাষণ তাই একজন ব্যারিষ্টার রাজনৈতিকের অগ্নিবর্ষী ভাষণের অতিরিক্ত কিছু নয়—যা উভয় দিকেই কাটে।

সৈন্যবাহিনী রাজনীতি সচেতন হওয়া চাই

"ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর বিদ্রোহ করার অধিকার আছে, কম্যাণ্ডার ইন চীফ তাঁর বেতার ভাষণে ঘোষণা করেছেন যে সশস্ত্র বাহিনীতে তিনি রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটতে দেবেন না এবং ডিসিপ্লিনই সেখানকার প্রথম ও শেষ কথা। আমি তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে একমত কিন্তু আমাদের সৈন্যবাহিনীকে একটি স্বাধীন দেশের সৈন্যবাহিনী হতে হবে।

"আমাদের সৈনিকেরা রাজনীতি ও তাঁদের কর্তব্যের মধ্যে একটা বিরোধ টেনে বিদেশী সরকারের আজ্ঞাবাহী ভাড়াটিয়া সৈনিকের কাজ করে যেতে পারেন না। আমার মতে আমাদের আর্মি ও নেভিকে সম্পূর্ণ রাজনীতি সচেতন হওয়া চাই, কেননা তাঁরা কেবল সৈনিকই নন তাঁরা সচেতন নাগরিকও-বটে, এবং সচেতন নাগরিক হিসাবে দেশের প্রতি তাঁদের কর্তব্য পালন করতে হবে। বর্তমানে আমাদের সৈনিকেরা তাঁদের দেশের প্রতি কর্তব্য ও সৈন্যানুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা এই দুই প্রেরণার বিপরীত-গামী সংকটের শিকার হয়ে পড়েছেন।

বিদ্রোহ করার নৈতিক অধিকার

"শ্রীভুলাভাই দেশাই প্র[illegible] আই-এন-এ বন্দীদের বিচারের সময় অনবদ্য ভাষায় পরাধীন সৈন্যবাহিনীর বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার সুন্দর ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমাদের সশস্ত্রবাহিনী তাই বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সকল নৈতিক অধিকার রাখে।

"সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আই-এন-এর ঘটনাবলী, সাম্প্রতিক আর, আই, এ, এফ, ও আর, আই, এন্-এর ধর্মঘট দেশের স্বার্থে বা মুক্তিতে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। জনসাধারণের ও সশস্ত্র-বাহিনীর মধ্যে যে দুরন্ত ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল তা এই সব অভিযান দূর করে দিয়েছে। আজ জনতা ও সৈন্যেরা পরস্পরের নিকটে এসে গেছে।

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বিশ থেকে পঁচিশ লক্ষ ভারতীয় যুবক আর্মি-নেভী ও এয়ারফোর্সে যোগ দেয়। এদের মধ্যে অনেকেই রাজনীতি সচেতন ছিলেন, কেহ কেহ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করেছেন। যুদ্ধের সময়ে সকল প্রকার নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলেছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বহুধরণের অপমান, জাতিগত বৈষম্য ও অত্যাচার ভোগ করেছেন; যুদ্ধের অবসানে এঁদের মধ্যে কেহ কেহ এই অপমান ও অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন যা নানাধরণের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে।

কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধতা ঠিক হয় নি

"এঁদের প্রতি আমার সকল সহানুভূতি আছে কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁদের অস্ত্রধারণ করা ঠিক হয় নি। এই ছেলেরা (boys) জানত যে তারা কতবড় শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছে। তাদের হাতে যথেষ্ট খাদ্য মজুত ছিল না, সামান্যই গুলি বারুদ ছিল অথচ প্রতিপক্ষের হাতে অস্ত্রশস্ত্র অন্যান্য শক্তি কতই না বিপুল। এই যুবকদের বিদ্রোহের প্রেরণা প্রতিপক্ষ সামরিক প্ররোচনা দিয়ে এই যুবকদের শত্রুর ফাঁদে পা দিতে বাধ্য করেছিল।

"সাম্প্রতিক আর-আই-এন ধর্মঘটে এই বীর নাবিক যুবকেরা একটা ভুল করে বটে কিন্তু তাদের ক্ষমা করা আমাদের কর্তব্য। এবং এদের প্রতি যাতে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তা দেখা কর্তব্য। কোন কোন সংবাদ পত্রে দেখলাম সর্দার প্যাটেল নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে এদের প্রতি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হবে না। *মৌলানা আজাদও নাকি ঐরূপ গ্যারান্টি দিয়েছেন। কিন্তু সর্দার প্যাটেল ও মৌলানা আজাদের পক্ষে ঐরূপ গ্যারান্টি দেওয়ার কোন ক্ষমতা নেই। একমাত্র গভর্ণ-মেণ্টই সেই জাতীয় প্রতিশ্রুতি দিতে এবং রক্ষা করতে পারে।

তবে ঘটনার তদন্ত চাই

"কর্তৃপক্ষকে কেবলমাত্র আর, আই, এন এর ছেলেদের ব্যাপারে নয়, কেবল বম্বের ব্যাপারে নয়, সমস্ত ভারতে

এজাতীয় বিদ্রোহ বিক্ষোভ প্রভৃতি ঘটনাগুলির প্রকাশ্য তদন্ত করা দরকার। অভিযুক্ত সমস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে আত্মসমর্থন করার সুবন্দোবস্ত করতে হবে—যেমন আই, এন, এর অভিযুক্ত সৈন্যদের ও অফিসারদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।……

"সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা আজ এ ধরণের ব্যবহার করছে কেন? কালের পরিবর্তন ঘটেছে। শাসকবর্গের জানা উচিত যে অতীতে যেভাবে এক দলকে অপর দলের বিরুদ্ধে লাগিয়ে, সৈন্য বাহিনীকে জনসাধারণের বিরুদ্ধে লাগিয়ে যেভাবে শাসন চলতো, আজকের দিনে তা হবার উপায় নেই। সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা আজ তাদের দেশের ও জনসাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য বুঝতে পারছেন

বিপ্লব সম্পর্কে নেহরু

"বিপ্লব ও গুণ্ডামী (rowdysm) এক জিনিস নয়। বস্তুত যে ধরণের বিপ্লবী কার্যকলাপ সামাজিক পরিবেশের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটায় না, তাকে প্রতি-বিপ্লবী কার্যকলাপ বলা যেতে পারে। এ হলো একধরণের বিপদজনক অ্যাডভেঞ্চার যাতে জনসাধারণের নৈতিক বুদ্ধি ও সংগঠনকেই দুর্বল করে দেয়। প্রত্যেক বিপ্লবেরই একটা সুচিন্তিত ও সুনির্দ্দিষ্ট নীতি বা স্ট্রাটেজী থাকে এবং সুপরিকল্পিত প্রচার থাকে। এসব ছাড়া বিপ্লব ব্যর্থ

হতে বাধ্য। কাজেই যে ধরণের বিপ্লবের মধ্যেই আমরা প্রবেশ করিনা কেন, আমাদের দেখতে হবে ডিসিপ্লিন রক্ষিত হচ্ছে কিনা এবং সমস্ত কার্যকলাপ সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হচ্ছে কিনা। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে অগ্রসর হতে হবে।"

বিদেশীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের নিন্দা

শহরের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও অরাজকতার উল্লেখ করে পণ্ডিতজী বলেন, "একদিকে সরকারের তরফ থেকে নির্বিচারে গুলীগোলার প্রয়োগ, শত শত ব্যক্তির মৃত্যু, অপর দিকে শহরের নানা সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির জন্য আমি মর্মাহত। জনসাধারণের কিছু কিছু অংশ যে ভাবে অনাচারী ব্যবহার করেছে, বিশেষত বিদেশীদের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছে, তাঁদের টাই, টুপির ধ্বংসসাধন করে তাঁদের অপমান করেছে, তীব্র ভাষায় আমি তার নিন্দা করি।"

সর্দার প্যাটেলের ভূমিকা

সর্দ্দার প্যাটেল জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাবের অপব্যবহার করে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি জনসাধারণকে বিপথে চালিত করেছেন তাদের সম্বন্ধে ভারতবাসীদের সচেতন করে দেন। প্যাটেলই এই সভার সভাপতি ছিলেন।

কংগ্রেস বিদ্রোহের ডাক দেয় নি

সর্দ্দার বলেন, "কংগ্রেস যেখানে কোন প্রকার বিদ্রোহের ডাক দেয় নি, উপরন্তু জনসাধারণকে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলেছে, সেখানে কেন জনসাধারণ বিদ্রোহ ও বিপ্লবের পথে পা বাড়িয়েছে তা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছি।" তিনি আরও বলেন :

"কংগ্রেসের নাম করেই যে সমস্ত কংগ্রেসের লোক জনসাধারণকে বিদ্রোহের জন্য উস্কানি দিচ্ছেন আমি তাঁদের সম্বন্ধেও দেশবাসীদের হুঁসিয়ার করে দিচ্ছি। জনসাধারণ একমাত্র কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের কথাই শুনবেন, আমি এটাই আশা করি। যদি আপনারা মনে করেন যে কংগ্রেস নেতৃত্ব ভুল করছেন, তাহলে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করুন। কিন্তু যদি কংগ্রেস নেতৃত্বই মানেন, তবে কংগ্রেসের আদেশ আপনাদের শুনতেই হবে।"

কমিউনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে

তিনি আরও বলেন যে কমিউনিষ্ট পার্টি জনগণকে ভুল নেতৃত্ব দিচ্ছে ও তাদের স্বদেশপ্রেমকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইছে। গত কয়েক বছরে তাদের মর্যাদা যে ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ করার জন্যই কমিউনিষ্ট পার্টি এ ধরণের উস্কানি

দিয়ে চলেছে বলে তিনি ঘোষণা করেন। ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করে কমিউনিষ্ট পার্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেন, সেই গ্লানি ও অপরাধকে মুছে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তাদের এই বিপ্লবীয়ানা।

"এই পার্টি এখন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের কথা বলছেন, কিন্তু কে আজ তাদের বিশ্বাস করবে বা করতে পারে? তাদের এই উস্কানি বেশীক্ষণ কার্যকর হতে পারে না, অচিরেই তাদের ব্যর্থতা প্রমাণিত হতে বাধ্য।"

ছাত্রদের নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন। যদি তারা, তাঁর মতে, কিছু ভাল কাজ করতে চান তবে তাঁরা যেন কংগ্রেসের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে মানেন।

সর্বাত্মক হরতালের ঘোষণায় প্যাটেলের উষ্মা

নৌবিদ্রোহের ফলে দেশে যে একটা ভয়ানক বিপদজনক পরিস্থিতি হয়েছে সেকথা প্যাটেল সভায় বলেন, এবং এই নৌবিদ্রোহের সমর্থনে শুক্রবার দিন শহরে যে সর্বাত্মক হরতালের ঘোষণা করা হয়েছে তাব বিপদজনক তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করেন। এই ধর্মঘট যাঁরা ঘোষণা করেছেন তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন বলে সর্দ্দার অভিযোগ করেন, যেহেতু তাঁরা সর্বাঙ্গীন

অবস্থার গুরুত্ব অনুভবই করতে পারছেন না। এ সমস্ত তথাকথিত জনদরদী নেতারা নিজেদের যেমন আত্মপ্রতারিত করছেন তেমনি জনসাধারণকে বিপথগামী করে জনসাধারণের ও শহরের প্রচুর ক্ষতি সাধন করেছেন।

সাংবাদিক বৈঠকে নেহরুর নরম গরম বাণী

চৌপাট্টিতে আগের দিনের বক্তৃতায় পণ্ডিত নেহরু এবং সর্দার প্যাটেলের বক্তৃতাতে জনসাধারণ সন্তুষ্ট হতে পারে নি বলেই হয় তো পরের দিন পণ্ডিত নেহরু আবার একটি প্রেস কনফারেন্সে তাঁর বক্তব্য দু'ঘণ্টা ধরে পেশ করেন। উপরন্তু, ধর্মঘটী নাবিকদের কোনো সাজা দেওয়া হবে না (No victimisation) এ রকম ধরণের প্রতিশ্রুতি ভারতের ব্রিটিশ সরকার রাখবার কোন লক্ষণই দেখাচ্ছিলেন না। ফলে পণ্ডিত নেহরুর পক্ষে বোম্বাইএর জনসাধারণকে সন্তুষ্ট রাখা সহজ হচ্ছিল না। এই প্রেস কনফারেন্সে আবার তাঁকে তাঁর স্বাভাবিক নরম গরম বাণীর বাক্য বিন্যাস করতে দেখা যায়। তিনি বলেন,—"আমি জানতে পেরেছি কমাণ্ডার-ইন-চীফের বেতার বার্তার ঘোষণা সত্ত্বেও ধর্মঘটী নাবিকদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার হুকুম চালু হয়েছে। কেবল আক্ষরিক অর্থেই নয়, তাদের সাজা সত্যি সত্যিই এমন ধরণের দেওয়া হচ্ছে যাকে ভীতিজনক ব্যবস্থা বলা চলে। (Terrorisation, not merely

victimisation)। কেন্দ্রীয় এসেম্বলীতে সহকারী যুদ্ধ-সেক্রেটারী মিঃ ম্যাসন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতিরও কোনো মূল্য দেওয়া হচ্ছে না।"

ব্রিটিশ, কংগ্রেস ও লীগের একই ভূমিকা

এখানে বলা উচিত হাজার হাজার রেটিং-কে তাঁদের কর্মস্থল থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে বিভিন্ন বন্দী শিবিরে আটক রাখা হয়—কয়েক বছর ধরে। এই পুস্তকের লেখক শ্রীবলাই চন্দ্র দত্ত বা শ্রী বি, সি, দত্ত তাঁদেরই মধ্যে অন্যতম ভুক্তভোগী একজন। ইনি কয়েক বছর লোকচক্ষুর অন্তরালে বন্দী শিবিরে ছিলেন। এঁদের ঘটনার অনতিকাল পরেই কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে। এই পণ্ডিত নেহরুই প্রধান মন্ত্রী হন, সর্দার প্যাটেল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হন, জিন্না সাহেবের দলও ক্ষমতায় আসেন। কিন্তু ধর্মঘটী নাবিকদের সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ সরকার পালন করে নি, কংগ্রেস এবং লীগ সরকারও তা পালন করে নি।

আণ্ডার গ্রাউণ্ড মুভমেণ্ট সম্পর্কে

উক্ত প্রেস কনফারেন্সে ১৯৪২ সালের আণ্ডারগ্রাউণ্ড মুভমেণ্ট সম্বন্ধে, অর্থাৎ,—অরুণা আসফ আলিদের কার্যকলাপ

সম্বন্ধে তাঁর মতামত কী—এ প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত নেহরু বলেন,—

"যেখানে খোলাখুলি ভাবে কাজ করা সম্ভব, সেখানে অন্য কোন ভাবে বা গোপন ভাবে কাজ করার চেষ্টা ফলপ্রসূ ত নয়ই, বরং অর্থহীন বলা যায়। গত দু-তিন বৎসর যখন অবস্থা সেরকম ছিল না, তখন ভিন্ন ধরণের কাজের কথা ভাবা যেতে পারে। এ বিষয়ে কেউ একমত হতে পারেন, না-ও পারেন। কিন্তু যখন খোলাখুলিভাবে কাজ করার অনেক ক্ষেত্র ও সুযোগ হয়েছে, সেখানে গোপনভাবে চলার কোন অর্থ হয় না। সেক্ষেত্রে জনসাধারণকেই গোপন করে চলার রেওয়াজ গড়ে ওঠে এবং সত্যিকার কোন গণ-আন্দোলন গোপনীয়তার পথে গড়ে উঠতে পারে না।"

অরুণার কার্যকলাপ সমর্থন করি না

অরুণা আসফ আলির গত কয়েক বছরের কার্যকলাপ তিনি পছন্দ করেন কি-না এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন,—"আমি তাঁর সব কার্যকলাপ সমর্থন করি না।"

হিংসা-অহিংসা প্রসঙ্গে

হিংসা ও অহিংসা সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন,—"আমি আমার নিজের কথাই বলতে পারি। হয় তো আরও

অনেকে এ বিষয়ে একমত হবেন। আমি মনে করি আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে আজ এবং অতীতেও অহিংসা ও তার রীতিনীতি উপযুক্ত—বর্তমান ভারতের ও পৃথিবীর পরিস্থিতির বিবেচনায়। যদি আমরা হিংসা নীতির কথাই ভাবি তবে আমাদের অধিকতর যোগ্য সহিংস উপায়ের কথা ভাবতে হবে। শত্রুপক্ষের সশস্ত্র শক্তির তুলনায় অপেক্ষাকৃত যোগ্যতর হিংসার বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতর হিংসার কথা ভাবা বোকামি মাত্র। কোন সশস্ত্র বাহিনীর সেনাপতি সেভাবে ভারেত পারেন না।"

এদেশে অহিংসার পথই শ্রেষ্ঠ

তবে কেন তিনি আই, এন্, এ, সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করে থাকেন এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত নেহরু বলেন, "আই, এন্, এর শিক্ষা থেকেই আমি বরং একথা বলি যে এদেশে অহিংসার পথই শ্রেষ্ঠ পথ। ভারতের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সশস্ত্র বা নিরস্ত্র যে ভাবেই হোক লড়েছেন, সে এক কথা, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণের কথা সম্পূর্ণ আলাদা কথা বা প্রশ্ন। আই, এন্, এ, সশস্ত্র পথ নিয়েছিলেন এবং তাঁরা ব্যর্থ হন। আই, এন্, এ, যদি সার্থক হতো, তবে প্রশ্ন কর্তা হয় তো বলতে পারতেন যে সহিংস সংগ্রাম সার্থক হয়েছে। আই, এন্, এ, ব্যর্থ হয়েছে সশস্ত্র অথবা

অহিংস সংগ্রামের জন্য নয়। ব্যর্থ হয়েছে বাহ্যিক পরিস্থিতির প্রতিকূলতার জন্য। পৃথিবীর বাস্তব অবস্থায় বৃহত্তর শক্তিগুলি তাদের প্রতিকূলে ছিলো বলেই তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন।

"আই, এন্, এর, সঙ্গে বর্তমান ভারতের পরিস্থিতির তুলনা চলে না। কেন না, আই, এন্, এ'-কে কাজ করতে হয়েছে দেশের বাইরে থেকে এবং সেক্ষেত্রে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কোন ক্ষেত্রই ছিল না। আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমার মনে হয় যখনই আমাদের দেশে হিংসা ও অহিংসার কথা ওঠে, তখনই আমরা স্থান কাল নির্বিশেষে শিশুসুলভ কথাবার্তা বলে থাকি। অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে তর্ক বিতর্ক করি। লোকে ভুলে যায় যে আমরা বিংশ-শতাব্দীর মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। যখনই আপনারা কোন দেশের মুক্তি বৈপ্লবিক সহিংস পথে আনবার কথা ভাবেন, তখন সে আভ্যন্তরীণ বিপ্লবী শক্তিকে বিনষ্ট করে দেবার জন্য রাষ্ট্রের হাতে কী রকম নিষ্ঠুর সহিংস শক্তি আছে, সেকথা আপনারা ভাবেন না। গত ৫০ বছরে রাষ্ট্রের Violence-এর ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সে শক্তি আজ রাষ্ট্রের এত বেশী যে জনগণের সাধারণ সহিংস শক্তি তার তুলনায় অতি নগণ্য। যাঁরা ব্যারিকেডের কথা বলেন, তাঁরা আজ ফরাসী বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কথা বলেন। আজ থেকে ১৫০ বছর আগে রাষ্ট্রের সশস্ত্র শক্তি ও বিদ্রোহী জনসাধারণের শক্তির মধ্যে পার্থক্যটা সত্যিই খুব বেশী ছিল না।

এমন কি আজকের দিনে সশস্ত্র বাহিনীর সৈনিক ও নাবিকদের সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কেননা, বিমান, ট্যাঙ্ক, ও বোমা প্রভৃতি অতি আধুনিক মারণাস্ত্র সাধারণতঃ সাধারণ সৈনিকের হাতের বাইরে।”

হিংসার পথ বৃথা হতে বাধ্য

তিনি আরও বলেন, “আজকের দিনে হিংসা ও অহিংসার নৈতিক তাৎপর্য নিয়ে তর্কের অবসর তত নেই, যত আছে, তাদের বাস্তব ব্যবহারের উপযোগিতা নিয়ে। হিংসার পথ সম্বন্ধে আলোচনাই বৃথা হতে বাধ্য—যদি না সৈন্যবাহিনীর হিংসাত্মক ক্ষমতার কথা আলোচ্য বিষয় না হয়। সামান্য ধরণের বা petty রকমের সশস্ত্র সংঘাত হয় তো সাময়িকভাবে একটা ত্রাস সৃষ্টি করতে পারে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জটিল অবস্থাও সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু শেষ বিচারে দেখা যাবে অধিকতর যোগ্য Violence এর ক্ষমতা কোথায় এবং কার। তাছাড়া এ ধরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহিংস প্রচেষ্টা বা সংঘর্ষ একটা অনিশ্চয়তার আবহাওয়া সৃষ্টি করে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত একটা ভারসাম্য স্থির করতে অসমর্থ হয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্যায়ন শেষ পর্যন্ত একটি বিকল্প স্থায়ী সর্বজন স্বীকৃত শক্তির বা authority-র জন্ম দিয়েছে, যে শক্তি বা authority-র সাহায্যে আমাদের ঈপ্সিত সমাজ ব্যবস্থা আনয়নের জন্য

প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ ফেলা চলে। কিন্তু যদি বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও অনিশ্চয়তা চলতেই থাকে, একটা স্থায়ী ভারসাম্য সৃষ্টি না হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিবর্তন ঘটান সম্ভব নয়।

ভুল ধারণা থেকেই সংঘর্ষ ঘটে

"আজকের দিনে ছোট ছোট বিদ্রোহাত্মক সংঘর্ষের প্রচেষ্টা আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা থেকেই সম্ভবপর। আমরা কোন দুর্বল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জাতি নই, আমরা শক্তিধর আন্দোলনের সন্তান, আমাদের পক্ষে ছোট খাট violence-এর চক্র সৃষ্টি করে চলা উচিত নয়। ভারতের প্রায় অনেক স্থানেই আমি আজ যা দেখতে পাচ্ছি, ছোট খাট ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের পথে অগ্রসর হয়ে অনেকেই ভাবেন যেন তাঁরা বিপ্লব ত্বরান্বিত করছেন। আমি বলি তাঁরা তা করছেন না, বরং তার বাধাই সৃষ্টি করছেন। যদি সত্যি সত্যিই সহিংস পথ ধরতে হয়, তবে তাকে বৃহৎ ও ব্যাপক আকারে সংগঠিত করতে হবে। তার জন্য প্রস্তুতি করতে হবে। ক্ষুদ্রাকারের violence কেবলমাত্র অহিংসার পক্ষেই বাধা নয়, সত্যিকার বৃহৎ violence-এরও অন্তরায়। এতে প্রতিপক্ষকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয় মাত্র, প্রতি-বিপ্লবী শক্তিকে জাগান হয় মাত্র।

কমিউনিষ্টরা বিপ্লবী নয়

বোম্বাই-এর সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে পণ্ডিত নেহরু বলেন,—

"বোম্বাই-এর 'রেটিং'-দের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি যে প্রচুর, সে কথা সহজবোধ্য। কামান ব্যবহারের ফলেই জনসাধারণের উত্তেজনা এত উচ্চ পর্যায়ে উঠে গিয়েছিল যদিও এই সমস্ত কামানের গুলী কোন ক্ষতিকারক হয় নি, তবু জনসাধারণ মনে করেছিল বুঝিবা দুই পক্ষের মধ্যে একটা ভয়ানক লড়াই সুরু হয়ে গেছে। কার্যতঃ লড়াইটা কিন্তু দুই পক্ষের মধ্যে অতটা কিছু ঘটে নি।

"শহরে নানা ধরণের নানা দল ও উপদল আছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের বিপ্লবী মনে করেন, অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীর রণকৌশলের উপরে যেতে রাজী নন। কমিউনিষ্টরা নিজেদের ভয়ানক বিপ্লবী বলে মনে করেন। কিন্তু আমি তাঁদের প্রতিবিপ্লবী মনে করি। তাঁরা বিপ্লবী ত' নয়ই, বরং কার্যতঃ ভয়ানক রক্ষণশীল!"

হরতালের প্রশ্নে নেহরুর রাগ

বোম্বাই শহরে আর, আই, এন, রেটিংদের প্রতি সহানুভূতির জন্য হরতাল করা উচিত কি-না, এই প্রশ্ন শুনে পণ্ডিত নেহরু হঠাৎ রেগে জ্বলে উঠে বলেন,—

"আর, আই, এন,-এর সেণ্ট্রাল ষ্ট্রাইক কমিটির এ ধরণের ধর্মঘট করার পক্ষে আবেদন করার কোন অধিকার নেই। আমি এ ধরণের কার্যকলাপ সহ্য করব না। এই ১৫টি লোক, তাদের আমি যতই পছন্দ করিনা কেন, তারা বোম্বাই অথবা ভারতবর্ষ এবং পৃথিবী সম্পর্কে কী জানে, বোম্বাই-এর সকলের মাথার ওপর দিয়ে সকল রাজনৈতিক দলকে অগ্রাহ্য করে, কোন্ অধিকারে তারা এই হরতালের আবেদন জানালো? তাদের উচিত ছিলো, এই ৩০ লক্ষ নাগরিকদের ডাকার আগে রাজনৈতিক দল-গুলিকে ডাকা এবং নিজেদের বক্তব্য উপস্থিত করা। একমাত্র কংগ্রেস অথবা লীগ এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী।"

কেউই কিছু করেন নি

উপরোক্ত মন্তব্য থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় সেদিনকার ভারতবর্ষের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহাত্মক সংঘর্ষগুলিকে পণ্ডিত নেহরু শান্ত বা দমিত করার জন্যই বিপ্লবের বৈজ্ঞানিক অজুহাতগুলি দিচ্ছিলেন। সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত বৈপ্লবিক নেতৃত্বের অভাবে নৌবিদ্রোহ ও অন্যান্য সব বিদ্রোহ ব্যর্থ হতে পারে, একথা যদি সত্যি হয়, তবে পণ্ডিত নেহরুর পক্ষে নিজেকেই সেই নেতৃত্ব সৃষ্টি করা অথবা দেওয়ার কী অন্তরায় ছিল? অন্যান্য তথাকথিত বিপ্লবীদের অপরিপক্কতা ও চিন্তার

স্থবিরতা নিয়ে ঠাট্টা করা চলে তাঁরই, যিনি বিকল্প সত্যিকার বৈপ্লবিক নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ভাবেন। কাজে কাজেই সহিংস ও অহিংস উভয় দিক থেকেই তৎকালীন বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে ব্যবহার করার জন্য কী মহাত্মা গান্ধী, কী পণ্ডিত নেহরু — কেউই কিছু করেন নি। জনসাধারণের প্রতি যত সহানুভূতি ও দরদই দেখান হোক্ না কেন, উত্তেজিত ধর্মঘটি নাবিকদের অথবা সহানুভূতিশীল বিদ্রোহী বোম্বাই-এর নাগরিকদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সেদিন পণ্ডিত নেহরু অথবা মহাত্মা গান্ধী পথে এসে জনতার সঙ্গে দাঁড়াননি—বা তাঁদের পরিচালিত করেন নি।

নেহরু ও প্যাটেল—দৃষ্টিকোণ একই ছিল

ফলাফলের দৃষ্টি থেকে দেখলে, পণ্ডিত নেহরু ও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মধ্যে এ বিষয়ে কোন পার্থক্য আবিষ্কার করা যায় না। সর্দার প্যাটেল যে কথা রূঢ় ভাষায় জনসাধারণকে বোঝাতে সক্ষম হন নি, সে কথাই পণ্ডিত নেহরু তাদের আস্তে আস্তে সইয়ে সইয়ে বুঝিয়েছিলেন মাত্র।

গণআন্দোলনে শ্রীমুন্সীর আতঙ্ক

বোম্বের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী কে, এম, মুন্সী সর্দার প্যাটেলের শক্ত নীতির সমর্থনে এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

"নাবিকদের আত্মসমর্পনের নির্দেশ দিয়ে সর্দার প্যাটেল বোম্বের মত মহান শহর ও ভারতবর্ষকে এক বৃহৎ সর্বনাশ থেকে রক্ষা করেছেন। কংগ্রেসের নির্দেশ ও ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করার দিন আসেনি। তথাকথিত দাঙ্গার প্রকৃতি সম্বন্ধে আজ সকলেরই সচেতন হওয়া উচিত। রাস্তায় সশস্ত্র সংগ্রাম কেমন করে করতে হয়, তার সুচিন্তিত ট্রেনিং দেওয়ার লক্ষণ দেখা যায়। কংগ্রেসের হাত থেকে গণআন্দোলনের নেতৃত্ব কেড়ে নেওয়ার মতলব প্রকাশ পায়। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের আবেদন অগ্রাহ্য করার চেষ্টাটা আপনা আপনি জনতার মধ্য থেকে আসেনি এবং রেটিং-দের নালিশ দূর করার উদ্দেশ্য থেকেও সৃষ্টি হয় নি। বোম্বের পুলিশ সমাজবিরোধীদের সঙ্গে সহজে যুঝে উঠতে পারছে না। বোম্বের পুলিশের কর্মনিপুণতা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকা সত্বেও আমি বুঝতে পারছিনা বোম্বের পুলিশ এ্যাক্ট অনুযায়ী কেন আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করা হয় নি।"

মিঃ জিন্না—আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখতে হবে

অল ইণ্ডিয়া মুসলীম লীগের প্রেসিডেণ্ট এম্, এ, জিন্না ২২শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৬) কলকাতায় নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন:

"খবরের কাগজে প্রকাশ যে আর, আই, এন, ধর্মঘট বোম্বেতে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। কলকাতা ও

করাচীর রেটিংরাও এই ধর্মঘটে যোগ দিয়ে অবস্থার গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলেছে। বোম্বে, করাচী ও কলকাতার সংবাদপত্রগুলি পাঠে বুঝা যায় যে নাবিকদের ন্যায়সঙ্গত নালিশ রয়েছে এবং দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ আজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। কোন সভ্য সরকারের পক্ষেই তাদের এই মনোভাবকে অগ্রাহ্য করা চলে না। আর, আই, এন, রেটিং-দের ন্যায়সঙ্গত নালিশ দূর করার কাজে আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে সাহায্য করতে প্রস্তুত, যদি নাবিকেরা নিয়মতান্ত্রিক, আইনসঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ের মধ্যে নিজেদের আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখেন এবং আমাকে সমস্ত তথ্য জানান তা'হলে আমি তাঁদের নালিশ দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"

মিঃ জিন্না আরও জানান যে ৮ই মার্চ তারিখে তিনি দিল্লী ফিরে যাবেন এবং তখন ভাইসরয়ের সঙ্গে নাবিকদের নালিশ নিয়ে তদবির করবেন। (ফ্রি প্রেস জার্ণাল, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬)

সেদিন কোন্ পক্ষে কত লোক ছিল

মনু সুবাদারের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় এসেম্বলীতে যুদ্ধ সেক্রেটারী মিঃ পি ম্যাসন বলেন:

"গত ছয় বৎসরে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে নিম্নলিখিত সংখ্যক ভারতীয় ছিলেন:

স্থল বাহিনীতে ভারতীয়দের সর্বোচ্চ সংখ্যা—

২০ লক্ষ ৫৩ হাজার

আর-আই-এন এ ৩২ হাজার ৯ শত ১৭

আর-আই-এ-এফ-এ ২৯ হাজার ৮ শত ২০

বলাবাহুল্য যে ভারতীয় রাজকীয় বিমান বাহিনীতেই প্রথমে ধর্মঘট সুরু হয়। তার পূর্বে ব্রিটিশের খাস রয়েল এয়ারফোর্সেও ধর্মঘট হয়। একথাও ব্রিটিশ সরকার স্বীকার করেন যে ভারতীয় নৌবহরে ধর্মঘটের প্রেরণা আর-এ-এফ ও আর-আই-এ-এফ থেকেই এসেছিল। এ স্বীকৃতির তাৎপর্য ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব কত সুদূর প্রসারী হতে পারতো যদি এই ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত আপোষহীন বিপ্লবের পথেই অগ্রসর হতো! ভারতীয় বিপ্লব আন্তর্জাতিক বিপ্লবের আবদ্ধ ধারাকেও হয়তো মুক্ত করে দিতে পারতো—এবং ব্রিটিশবাহিনীর কাছ থেকেও প্রতিবন্ধক কিছু দুরূহ হতো না—ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সৈনিকেরা তো নৌবিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীলই হয়ে পড়েছিল। এমন কি গুর্খা বাহিনীতে স্থানে স্থানে ধর্মঘট দেখা দেয়।

তা ছাড়া বোম্বে, কলিকাতা, করাচি, প্রভৃতি নগরগুলিতে বিদ্রোহীদের সমর্থনে লক্ষ লক্ষ লোক রাস্তায় নেবে পড়েছিলেন ও আহত ও নিহত হয়েছিলেন শত শত লোক।

এই পরিপূর্ণ বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মুখে উপস্থিত হয়েই ব্রিটিশ সরকারকে ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। প্রধানমন্ত্রী এটিলী সাহেব তো পার্লামেণ্টে ঘোষণাই করে দেন যে ভারতকে

পরাধীন রাখতে হলে বৃটিশ বাহিনীকে নতুন করে ভারতকে দখল করতে হবে—এবং লক্ষ লক্ষ বৃটিশ নওজোয়ানের দরকার হবে—আজকের ব্রিটিশ নওজোয়ান আর সে ধরণের অভিযানে যোগ দেবে না।

বিদেশী সংবাদপত্রগুলির মন্তব্য

ব্রিটেনের ৮টি জাতীয় সংবাদপত্রের মধ্যে ৭টি আর, আই, এন্, নৌবিদ্রোহের সংবাদের প্রাধান্য দিয়ে খবর পরিবেশন করেন। আর লেবার পার্টির মুখপত্র "ডেলী হেরাল্ড" খবরটিকে দ্বিতীয় স্থান দেন—তাঁদের বোম্বের সংবাদদাতার সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে।

রক্ষণশীল দলের কাগজ "ডেলী এক্সপ্রেস" এ চমকপ্রদ হেড লাইন হল—Mob out of hand (জনতা হাতছাড়া), 'পুলিশের গুলীবর্ষণ'। ডেলী মিরর-এর হেড লাইন—"বিদ্রোহীদের আসন্ন সর্বনাশ" (Doom threat to mutineers)। 'ডেলী হেরাল্ড'-এর হেড লাইন—"Army 'peace-man' told—Stop navy Strike."।

'ডেলী হেরাল্ড'-এর সংবাদদাতা সাদার্ণ কমাণ্ডের কমাণ্ডার-ইন্-চীফ জেনারেল লকহার্ট-এর বোম্বে উপস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করেন—'নৌবিদ্রোহ দমন করার জন্য নৌ-সেনাধ্যক্ষের পরিবর্তে একজন আর্মি অফিসারকে ডাকা বিশেষ ইঙ্গিত ও গুরুত্বপূর্ণ।"

তিনটি কাগজ সম্পদকীয় মন্তব্য করেন। তাঁদের মধ্যে 'ডেলী এক্সপ্রেস' ও 'ডেলী মেল' ধীরতার সঙ্গে নৌবিদ্রোহ দমন করার সুপারিশ করেন। তৃতীয় কাগজটি, কমিউনিষ্ট পার্টির 'ডেলী ওয়ার্কার' বলেন, "ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের তরঙ্গের শীর্ষতম তুঙ্গ উপস্থিত।"

নিউইয়র্ক টাইমস্-এর সম্পাদকীয়

ফেব্রুয়ারী ২৩ তারিখের 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্'—প্রাচ্য দেশে বিদ্রোহ' (Revolt in the east) শিরোনামায় এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। তাতে বলেন, "মিঃ এটিলীর স্বাধীনতা ও ন্যায়ের উপর প্রতিশ্রুত সরকার ভারতে বিশৃঙ্খলা দমন করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন বলে জয়ী অথবা আত্মসন্তুষ্ট হবার কারণ নেই। বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের কারণগুলি দূর করতে হবে। সমস্ত পৃথিবীতেই অশ্বেতকায় জাতিসমূহ গভীর ও বিস্তৃত অসন্তোষের সমুদ্রে বিক্ষোভের তরঙ্গের পর তরঙ্গ সৃষ্টি করে চলেছে। এবং তাদের সংখ্যা সমগ্র মানব জাতির অর্ধেকের কম নয়।

"আজ আমাদের এ সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হতে হবে যে অশ্বেতকায়দের ওপরে শ্বেতকায়দের সাম্রাজ্য শাসনের অবসান হতে চলেছে।"

"আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা" ও "মানবাধিকারের সনদ" (Bill of Rights) এখনও তার কাজ করে চলেছে।

পরাধীন জাতিসমূহ আজ তাদের সাবালকত্ব অর্জন করতে চলেছে—এ কথা স্পষ্ট। এই সত্যকে প্রাক্তন মনিব জাতিদের স্বীকার করে নেওয়া দরকার। ফিলিপাইনে আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র এই সত্যকে স্বীকার করে সকলের জন্য একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন।”

ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট মুখপত্র ‘ডেলী ওয়ার্কার’

ডেলী ওয়ার্কার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আর, আই, এন্‌ ধর্মঘট সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য দেখা যায়:

“ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের চাপ ও বিক্ষোভের তরঙ্গগুলি ‘নৌবিদ্রোহ’ তুঙ্গতম পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।”

“ভারতবর্ষ স্বাধীনতা চায় কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে এযাবৎ যা কিছু প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন, তার মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সুচতুর ভেদ নীতি তাঁরা লক্ষ্য করেন। ভেদ নীতির মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করার চিরাচরিত নীতিই তাঁরা দেখতে পান।”

“ক্রমবর্ধমান দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতির পটভূমিকা এ সময়ে মনে রাখা দরকার।

“এহেন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা ভারতে যাচ্ছেন।

"এ বিষয়ে কোন অস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত নয় যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সম্প্রতি ঘোষিত নীতির যদি পরিবর্তন করা না হয়, তবে তাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য।

"ভারতীয় জনমত কখনই এমন ধরণের সংবিধান রচয়িতা সংস্থাতে রাজী হতে পারে না, যা ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতিবন্ধকতা দিয়ে ভারাক্রান্ত থাকবে—বিশেষ করে যদি সে সংস্থায় সামন্ত-তান্ত্রিক রাজন্যবর্গ দ্বারা অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত করে তোলা হয়।

"ভারতীয় জনসাধারণ ভারতীয় সংবিধান রচনায় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ছাড়া আর কারও হস্তক্ষেপ আজ স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়।"

(রয়টার, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬)

ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি ও কার্যকলাপ

২৩শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৬) তারিখে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটির সদস্য ডঃ জি. অধিকারী নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন :

"বোম্বের শ্রমিক ও নাগরিকেরা আর, আই, এন্-এর নাবিকদের প্রতি ও তাঁদের দেশাত্মবোধক দাবীসমূহের প্রতি সহানুভূতি ও আনুগত্য প্রকাশ করেছেন।

"উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদ আর, আই, এন্, ধর্মঘটীদের বিদ্রোহী বলে অভিযুক্ত করতে দ্বিধা করে নি এবং তাদের নৌবাহিনীসহ

ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছে। গতকাল ধর্মঘটীদের সমর্থক হাজার হাজার নাবিকের ওপর নির্বিচারে গুলীবর্ষণ করতে দ্বিধা করে নি— সেই একই সাম্রাজ্যবাদ।

"ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী আর্মার্ড কার-এ রাস্তায় রাস্তায় টহল দেয় এবং জনতার ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। জনতা যেখানে ঘনসন্নিবদ্ধ হয়, কোন প্রকার হুঁশিয়ারী না দিয়েই গোরা সৈন্যরা সেখানে বেশী গুলীবর্ষণ করে। প্যারেলের শ্রমিকাঞ্চলে মেয়ে ও পুরুষের ওপরে এভাবেই গুলি করা হয়। প্যারেল মহিলা সংঘের কমরেড কমলা ডোংগে নিহতদের মধ্যে একজন।

"ব্রেন গান, ট্যাঙ্ক ও বম্বার-এর সাহায্যে ভারতীয়দের ভয় দেখাবার দিন চলে গেছে। আমাদের এই শহরে যদি শক্তিমদমত্ত সাম্রাজ্যবাদ মনে করে যে সপ্তাহব্যাপী 'জালিয়ানওয়ালা-বাগ' সৃষ্টি করে নাগরিকদের দমন করা যাবে, তবে তাঁরা ভুল করবেন। এই রক্তস্নান আমাদের মধ্যে ঐক্যের সিমেণ্টকে আরও শক্ত করবে এবং এই সন্ত্রাসের রাজ্যকে দূর করার প্রতিজ্ঞাকে আরও দৃঢ়তর করবে।

শান্তিপূর্ণ ও নিরুপদ্রব প্রতিবাদের আহ্বান

"শুক্রবারের গণ নরহত্যার শান্তিপূর্ণ ও নিরুপদ্রব প্রতিবাদে আমি সকল রাজনৈতিক দলকে একটি সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল ডাকিতে আহ্বান করি। আহত ও নিহতদের পরিবারদের সাহায্য

করার জন্য অবিলম্বে নাগরিকদের শান্তিরক্ষা ও বন্দীমুক্তি কমিটি (Peace and Release Commitee) গঠন করা হোক।

কংগ্রেসের কাছে কমিউনিষ্ট নেতার অনুরোধ

"কংগ্রেস নেতাদের প্রতি বিশেষ করে আমার এই অনুরোধ যে তাঁরা যেন বোম্বে ও ভারতের অন্যত্র ধর্মঘটী নাবিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী মেটাবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কেননা, আর, আই, এন্ ধর্মঘটীদের ব্যাপারটি আজাদ হিন্দ ফৌজের মতই একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দায়িত্বের আকার গ্রহণ করেছে এবং জাতিগত সুবিধার ঊর্দ্ধে ন্যায়সঙ্গত সন্তোষজনক মীমাংসার চেষ্টা করা হোক।"

ধর্মঘট সম্বন্ধে সোভিয়েট মতামত

মস্কো, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬,

"রেডফ্লিট" নামক কাগজে ভারতের নৌবিদ্রোহ সম্বন্ধে আজই প্রথম মন্তব্য করা হয়।

এম, মিখিলভ ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে এক প্রবন্ধে বলেন: "নাবিকদের বিদ্রোহ জনসমর্থিত। বর্তমান ভারতে যে ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, নৌবিদ্রোহ তার একটি প্রকাশ। অর্থনৈতিক দুরবস্থা এই বিদ্রোহের অন্যতম কারণ—জনসাধারণ

নিদারুণ দারিদ্র-পীড়িত। কৃষিতে চরম সংকট দেখা দিয়েছে, শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন দ্রুতহারে হ্রাস পাচ্ছে।

"ভারতের সর্বত্র যে অনির্বান বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে তাতে জনগণের স্বাধীনতা স্পৃহা কতটা তীব্র হয়েছে তাই বোঝা যায়" —রয়টার।

ফরওয়ার্ড ব্লক ও আর-আই-এন

২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সর্বভারতীয় ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রেসিডেন্ট শ্রীআর-এস-রুইকর সংবাদপত্রে নৌধর্মঘটিদের সমর্থন করে এক বিবৃতি দেন। রেটিংদের প্রতি জাতিপক্ষপাতহীন ব্যবহার, ন্যায়সঙ্গত নালিশের সন্তোষজনক মীমাংসা দাবি করেন এবং নাবিকদের দাবীসমূহ যে ন্যায্য ও মডারেট সে কথাও বলেন।

৪ঠা মার্চ তারিখে আর-এস-রুইকর বোম্বাই যান, সেখানে তাঁকে কংগ্রেস কর্ম্মীরা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা দেন। উত্তরে রুইকর বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের ইতিহাসের শিক্ষার বর্ণনা করেন। নৌবিদ্রোহীদের তিনি সমর্থন করেন। অমান্য ও উন্মুক্ত বিদ্রোহ করার জন্য তিনি রেটিংদের উপর দোষ দেন না, তাঁদের বাধ্য করেই, প্ররোচনা দিয়েই বিদ্রোহী করে তোলা হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন। শহরে নানা ধরণের উৎপাতের জন্য দায়ী গুণ্ডা শ্রেণীর লোকদের উপর সব দোষ চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে রুইকর বলেন যে প্রত্যেক বিপ্লবেই নিম্নস্তরের জনগণই

প্রধানত অংশ নিয়ে থাকেন, আর উচ্চশ্রেণীর প্রবক্তারা আরাম-কেদারায় বসে বড় বড় নৈতিক বুলি আউড়িয়ে থাকেন। যাঁরা 'হয় করবো নয় মরবো' বলে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁদের সমালোচনা করা এই সব আরামকেদারার রাজনৈতিকদের মুখে সাজে না। পেথিক লরেন্সের মিশন ভারতীয় জনগণের এই নবজাগরণকে ক্লান্ত ও বিপথগামী করার জন্যই প্রেরিত হয়েছে বলে তাঁর ধারণা।

আর, আই, এন, তদন্ত কমিশনে শ্রীবলাই চন্দ্র দত্তের সাক্ষ্য

বম্বে ১৬ই মে ১৯৪৭—

আজকের আর, আই, এন, তদন্ত কমিশনের সামনে শ্রীবলাই চন্দ্র দত্তকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দীর্ঘ সময় ধরে জেরা করা হয়। শ্রীদত্ত এইচ, এম, আই, এস, 'তলোয়ার' এর টেলিগ্রাফ বিভাগের শীর্ষকর্মী, গত ফেব্রুয়ারী মাসে ধৃত হন; তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি বিভাগীয় গৃহে আপত্তিকর স্লোগান লিখেছিলেন এবং ফলে কর্মচ্যুত হয়েছিলেন।

২রা ফেব্রুয়ারীতে তাঁকে গ্রেপ্তারের সময় তলোয়ারে অবস্থান-কালীন তাঁর বাস কক্ষ থেকে প্রাপ্ত কিছু জিনিসপত্র কমিশনের সামনে প্রদর্শিত হয়। এর মধ্যে ছিল—অশোক মেহতা লিখিত '১৮৫৭ সালের ভারতীয় বিদ্রোহ', শ্রীদত্তের দুটি নিজস্ব ডায়েরী,

একটি ২০৫ টাকার আই, এন, এ, রিলিফ ফাণ্ডের রসিদ বই, আজাদ হিন্দ প্রতিজ্ঞাপত্রের একটি কপি, একটি পোস্টকার্ড—এক্সসার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মিঃ ওয়াই, কে, মেননের লেখা, একটি প্রচার পত্র শিরোনামা 'আজকের চিন্তা', এবং বন্ধুবান্ধবকে দত্তের লেখা ও দত্তকে লেখা কয়েকটি চিঠি।

কানে কানে প্রচার

শ্রীদত্তের নিজস্ব ডায়েরীতে ৬ই জানুয়ারী তারিখে লেখা আছে :

It will be a great blow to our 'whis. Camp'।
পাওয়ারের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীদত্ত স্বীকার করেন ঐশব্দটির পুরো কথা—'Whispering campaign' (কানে কানে প্রচার)।

শ্রীদত্ত whispering campaign কথাটির বিশদ ব্যাখ্যা করে বলেন এর দ্বারা তিনি আর, আই, এন, এর আগ্রহী রেটিংদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য ভারতের ঐতিহাসিক পটভূমি, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস এবং ঐ ধরণের বিষয়গুলি আলোচনা করতেন! এ সমস্ত বিষয় প্রকাশ্য সভা করে বলার সুযোগ তাঁর না থাকাতে তাঁকে ঐ পন্থা নিতে হয়েছিল।

লেঃ পাওয়ার : আমি বলছি যে আপনার এই 'whis camp' ব্যবহৃত হয়েছিল এঁদের বিদ্রোহে উৎসাহ দেবার জন্য।

শ্রীদত্ত : আমি অস্বীকার করছি।

একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীদত্ত বলেন যে যখন আগষ্ট বিপ্লব সুরু হয় তখন তিনি ভারতে ছিলেন না, কিন্তু এ সম্বন্ধে পড়েছিলেন এবং তাঁর খুবই ভাল লেগেছিল।

লেঃ পাওয়ার ঃ আমি বলছি যে আপনি খুবই খুশী হতেন যদি সৈন্যবাহিনী ঐ আন্দোলনে যোগ দিত।

শ্রীদত্ত ঃ কে না খুশী হত!

লেঃ পাওয়ার ঃ আপনি কি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতেন যদি তখন আপনি সিঙ্গাপুরে থাকতেন?

শ্রীদত্ত ঃ নিশ্চয়ই। যোগ দিতে না পারলে দুঃখিত হতাম।

রাজনৈতিক স্লোগান

সাক্ষী বলেন যে বোম্বাই সহরে নৌ-দিবসে সমগ্র তলোয়ার প্রতিষ্ঠানটি লিখিত স্লোগানে ভরে গিয়েছিল। স্লোগানগুলি ছিল; 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক,' 'ভারতছাড়' এবং 'সমস্ত সাদা কুকুরদের হত্যা কর'। শ্রীদত্ত বলেন ১লা ফেব্রুয়ারীতে তিনি প্ল্যাটফর্মে দুটি স্লোগান লিখেছিলেন—যেখান থেকে আর, আই, এন, এর ফ্ল্যাগ অফিসারের বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল।

লেঃ পাওয়ার ঃ আপনাদের অভিযোগগুলি যখন রাজনৈতিক ছিল না তখন আপনারা কেন বিশেষ করে রাজনৈতিক স্লোগানগুলি বেছে নিলেন?

শ্রীদত্ত ঃ আমরা ঐরকমই অনুভব করেছিলাম।

লেঃ পাওয়ার ঃ আপনি নিজে কি মনে করেন যে খাদ্য, পরিবহন ব্যবস্থা ও অন্যান্য অভিযোগগুলির গুরুত্ব কম ছিল ?

শ্রীদত্ত ঃ ওগুলি খুব তুচ্ছ ব্যাপার।

শ্রীদত্ত বলেন যে তাঁর ডায়েরীর এক জায়গায় "H. Q" অক্ষর দুটি কমিউনিষ্ট পার্টির হেড কোয়ার্টার রূপেই উল্লিখিত ছিল। তিনি আরও বলেন যে তিনি নিজে কমিউনিষ্টদের কার্যকলাপ পছন্দ করেন না, তাঁর মনে হয় কমিউনিষ্টরা "দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা" করেছে এবং তিনি চেষ্টা করেছেন তাঁর সহকর্মীদের কমিউনিষ্ট আদর্শ থেকে অন্য আদর্শে সরিয়ে নিয়ে যেতে।

শ্রীদত্ত কমিশনের কাছে অভিযোগ করেন যে এখানে পুলিশ তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করছে এবং বাঙ্গলাদেশে তাঁর পরিবারবর্গকে হয়রানি করছে।

(বিদ্রোহের রিপোর্ট ঃ - অমৃতবাজার পত্রিকা ২০শে থেকে ২২শে জানুয়ারী)

———